পূর্ব-মীমাংসা

পূর্ব-মীমাংসা

[illegible] গুপ্ত

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই মাঘ
১৮৭৭ শকাব্দ

দু টাকা
আট আনা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীঅজিত ঘোষ
শরৎ-প্রকাশ মুদ্রণী
৬৪।এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

উৎসর্গ

শ্রীকালীপ্রসাদ চক্রবর্তী

পূজনীয়েষু

সার্শি ফেলে দিয়ে ভিজে মুখ এবং মাথা রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে সুবোধ বললে, ইঞ্জিনের সামনে খুব ভিড়, বোধ হয় য়্যাকসিডেণ্ট হয়েছে। আমি যাই, ব্যাপারটা কি দেখে আসি।

সুবোধ নেমে পড়ল। জলে ভেজার ভয়ের চেয়ে কৌতূহল তীব্রতর, এমন আরও কয়েকজন সঙ্গে সঙ্গে নেমে ইঞ্জিনের দিকে এগিয়ে গেল।

দশ পনের মিনিট পরে তারা যখন ফিরে এল, ঝিমানো কামরা তখন উত্তেজনার সম্ভাবনায় বেশ সজাগ হয়ে উঠেছে। কোরাস প্রশ্ন উঠল, কি দেখলেন মশায়? সত্যি য়্যাকসিডেণ্ট?

বাঙ্কের একটা স্যুটকেশের হাতলে ভিজে পাঞ্জাবিটা কায়দা করে ঝুলিয়ে গেঞ্জি নিংড়োতে নিংড়োতে সুবোধ বললে, হ্যাঁ, য়্যাকসিডেণ্ট বৈ-কি।

'মারা গেছে', 'কে মরল', 'বাঙালী', 'কুলিটুলি হবে বোধ হয়', 'কেমন করে মরল' প্রভৃতি বিমিশ্র প্রশ্নের জবাবে সুবোধ জানাল যে, হ্যাঁ, একেবারেই মারা গেছে। বাঙালী ভদ্রলোক, তবে গৃহী নয়, সাধু। পরণে গেরুয়া ছিল, কপালে শুকনো তিলকের রেখাও দেখা গেছে, কেস আত্মহত্যার। ড্রাইভার বলে, লোকটা লাইন থেকে অল্প তফাতে দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন নিকটবর্তী হতে হঠাৎ লাফ দিয়ে নিজের দেহটাকে দুই লাইনের ব্যবধানের মধ্যে নিক্ষেপ করে। গাড়ীর চাকা সাধুর কোমরের ওপর দিয়ে চলে গেছে।

সাধু! একে য়্যাকসিডেণ্ট, তায় আত্মহত্যা, তায় কুলি-কামিন নয়, ছাঁ-পোষা গৃহস্থ নয়, সংসার-ত্যাগী সাধু! কামরা যেন খোঁচা-লাগা মৌচাকের মত গুঞ্জনময় হয়ে উঠল। যদিও যাত্রীরা অধিকাংশই পরস্পর অপরিচিত, তবুও যেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি সাব-কমিটির মত কয়েকটি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে

তারা দু'য়ে দু'য়ে, তিনে তিনে, পাঁচে পাঁচে এই দুর্ঘটনার তথ্য আলোচনায় নিবিড় হয়ে উঠল। অবশ্য, ট্রেনের কামরায় কোন আলোচনার নিবিড়তাই স্থায়ী হয় না। এদের আলোচনাও এই দুর্ঘটনার বিশেষ প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে য়্যাকসিডেণ্ট সম্বন্ধে যাত্রীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতার গল্পে শাখায়িত হয়ে ক্রমে সিনেমা-থিয়েটার, সমাজ-ব্যবস্থা এবং ধান-চাল ও বিলাস-সামগ্রীর চড়া দরে এসে ধারা হারাল।

ট্রেন ততক্ষণ মোগলসরাই স্টেশনে থেমে পুনর্যাত্রা শুরু করে বেনারসের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান হয়েছে। রাত্রি গভীর হওয়ায় কামরার মধ্যে দলবদ্ধ ঢুলুনি নেমেছে। কেবল প্রান্তের বেঞ্চের তরুণ-বয়স্ক সেই কয়টি ছাত্রের সোৎসাহ আলোচনায় তখনও ছেদ পড়েনি। নানা কথার পথ বেয়ে তাদের সমস্যা শেষে এই প্রশ্নে কেন্দ্রীভূত হয়েছে যে, যে সাধু, যে গৃহ-সংসার, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, ভোগ-বিলাস, সকল কিছু পরিত্যাগ করে শান্তির জন্য সন্ন্যাস নিয়েছে, তার আত্মহত্যার প্রয়োজন হয় কেন?

অবশেষে নন্দগোপাল হিমালয় খেয়ে ফেলতে পারে এমনভাবে মুখ ব্যাদান করে হাই তুলে মন্তব্য করল, তুমিও যেমন! সাধু-ফাধু বাজে কথা, লোকটা হয়তো ফেরারী আসামী ছিল, শ্রীঘরের আতঙ্কে অতিষ্ঠ হয়ে রেল চাপা পড়ে রেহাই পেল।

গিরীন ঈষৎ ধর্মভীরু। দেব-দানব, যোগ-যাগে তার আস্থা আছে। ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, কেন, আত্মহত্যা করেছে বলেই সাধু সাধু হবে না, ফেরারী আসামী হবে, তার কি মানে আছে?

সুবোধ এর ওপর কি একটা কড়া মন্তব্য করল এবং এইভাবে অচিরে অনেকগুলো গলা সপ্তমে ওঠায় ওখানকার হাওয়া আবার গরম হয়ে উঠল।

নিকটেই একটা বেঞ্চের কোণে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক মুখে আধপোড়া চুরুট এবং একটু হাসির রেখা নিয়ে এদের আলোচনা শুনছিলেন। বাদ-প্রতিবাদের তালে তালে তাঁর মুখের মাঝে অনুমোদন অথবা অসম্মতির আভাও ফুটে উঠছিল। কিন্তু গায়েপড়া হয়ে এ যাবৎ আলোচনায় কোন অংশ নেননি।

এক সময়ে সুবোধ বললে, না, তোমাদের ঝগড়া আর মিটবে না। বেশ তো, ইনি সব শুনেছেন, বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক বড়, প্রবীণ আর অভিজ্ঞ। এস, আমরা এঁকেই সালিশ মানি।

বলে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললে, আপনি কি বলেন? ধর্ম কি কেবল শুধুই সংস্কার, না সত্যিই মানুষকে শান্তি দিতে পারে? যদি শান্তিই দেয়, তাহলে যারা ধার্মিক, যারা সাধু তাদের আত্মহত্যার মত ভয়াবহ পরিণতি ঘটে কোন্ পাপে?

ভদ্রলোক বোধকরি এই আমন্ত্রণেরই অপেক্ষা করছিলেন। মুখ থেকে দুই আঙুলের মধ্যে চুরুটটা নামিয়ে চিন্তিতের ভঙ্গীতে আস্তে আস্তে বললেন, প্রশ্নটা কঠিন। আমি সাধু নই, কাজেই কোন প্রামাণিক মত দিতে পারব না। শুধু ভূয়োদর্শনের ওপর দুটো একটা কথা বলতে পারি।

এরা বললে, আমরা সেইটুকুই শুনতে চাই।

দেখুন, ভদ্রলোক বললেন, ভারতবর্ষে ধর্মকে যেরকম নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়, তাতে সাধুর পক্ষে আত্মহত্যা করা আশ্চর্য নয়।

নন্দগোপাল বললে, উক্তিটা একটু স্ববিরোধী হল না?

ভদ্রলোক ঈষৎ দৃঢ়ভাবে জবাব দিলেন, না। তার কারণ বলছি। আমাদের দেশে ধর্মটা তো শুধু কতকগুলো রীতি নীতি আচার সংস্কার মাত্র নয়; ধর্ম মানে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের মধ্যে আমরা বাস করছি, তাকে অস্বীকার করে আমাদের মধ্যে একটা

অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম লোক আবিষ্কার করা। কিন্তু বিপদ এইখানেই। বস্তুজগতের কোন ঘটনা যত রহস্যময়ই হোক, আমরা তাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে যাচাই করতে পারি, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে পারি। তার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমরা আজ না হোক কাল একটা হদিস পাই-ই পাই। কিন্তু ধর্ম আমাদের যে সূক্ষ্মলোকে নিয়ে যায়, ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধির সেখানে প্রবেশ নিষেধ। অন্ধকার রহস্যগর্ভ বিশাল গিরিগুহার মত এই সূক্ষ্ম লোকে প্রবেশ করে সাধক দিশাহারা হয়। সাধনার ফলে যে দিব্য আলো তার চোখে পড়ে, তা বিদ্যুতের মত তীব্র, কিন্তু সেই রকমই ক্ষণিক। তাতে গাঢ় অন্ধকার আরও হয়, রহস্য আরও নিবিড় হয়। তখন বাইরের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় জগৎকেও সে আর মেনে নিতে পারে না, অথচ অন্ধকার স্বল্প-পরিচিত ওই গিরিগুহার সঙ্গেও নিজের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে অক্ষম হয়। ফলে যে দ্বন্দ্ব, যে বুদ্ধি-বিভ্রম, তাতে কোন পরিণতিই তো বিস্ময়কর নয়।

তরুণেরা সকলেই নিরুত্তর রইলো। তারা তর্ক করছিল তর্ক হিসাবে। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য আর আন্তরিকতায় তারা যেন অস্বস্তি বোধ করল। কেবল গিরীন অবিশ্বাসের স্বরে জবাব দিল, এ আপনি কি বলছেন! আমাদের দেশে কত সত্যদ্রষ্টা সাধু মহাপুরুষ জন্মে গেছেন, তাঁরা ভাবমুখে কত কি অলৌকিক কাণ্ড দেখেছেন শুনেছেন, সে সব কি মিথ্যা?

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি চুরুটধরা হাতটা অন্য হাতের সঙ্গে জোড়া করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, যাঁরা সাধু মহাপুরুষ, তাঁরা নমস্য। আমি বাস্তবিকই তাঁদের সম্বন্ধে কিছু জানি না। আমার উক্তি কেবল তাদের সম্বন্ধে যারা সাধু, কিন্তু মহাপুরুষ নয়। কিন্তু শুধু কথায় সম্ভবত আপনারা আমার বক্তব্য বুঝতে পারছেন না। আমি আপনাদের একটা ঘটনা শোনাই। আমরা সকলেই বেনারসে

নামব। স্টেশন আসতে বহু বিলম্ব। ততক্ষণে আমার গল্প বলা হয়ে যাবে।

ছেলেরা সায় দিল। নন্দগোপাল তার পিছনের দুখানা সার্শি টেনে তুলে দিল। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে অনুভব করল, বৃষ্টি তখনও টিপি টিপি হচ্ছে, তবে এমন নয় যে, ভিতরে ছাট আসবে। সে-দিকে তাকিয়ে আর একটি যুবক বললে, মাসটা আষাঢ়, গল্পটা আষাঢ়ে নয় তো?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, না না, যাকে নিয়ে গল্প তাকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করে কপালে বারকয়েক টোকা মেরে মনে মনে কাহিনীটাকে গুছিয়ে নিয়ে শুরু করলেন :

অনেকদিন আগে, আমার বয়স যখন প্রায় আপনাদের মত, তখন আমার বাতিক ছিল দেশে দেশে ঘোরা। রেল কোম্পানী তখন অসম্ভব সস্তায় দেড় মাসের কনসেশন টিকিট ইস্যু করত। একবার পূজার ছুটিতে তেমনি একখানা টিকিট নিয়ে পাড়ি মারলাম মুসৌরীতে। নামবার পথে মনে হল, হরিদ্বারটা ঘুরে যাই। শুনেছিলাম জায়গাটা ভারী মনোরম।

হরিদ্বার ধর্মের দেশ, ধর্মশালারও দেশ। গঙ্গার ধারে ধারে বড় বড় দু'তলা তিনতলা মজবুত বাড়ী। ঝকঝকে তকতকে, হঠাৎ দেখলে প্রাসাদের সঙ্গে তুলনা দিতে ইচ্ছে করে। এগুলোর অধিকাংশই ধর্মশালা। ভোলাগিরি আশ্রমে খাবার ব্যবস্থা করে এমনি একটা ধর্মশালার একখানা একতলা ঘরে কম্বল বিছিয়ে লেটে পড়লাম।

সপ্তাহ তিনেক পশ্চিমে ঘুরে ওদিককার অসমতল জমি, চোয়াড়ে মুখ আর রুক্ষ বুলির উপর মনটা ক্ষেপে উঠেছিল, কেবলই চাইছিল বাঙালী দেখতে, বাংলা বুলি শুনতে। বিশ্রাম সেরে বিকালবেলা উঠেই দ্বারবানের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ধর্মশালায় আর কোন বাঙালী যাত্রী উঠেছে কি না। তক্তপোশের ওপর বসে দ্বারবান রামায়ণ পড়ছিল। তুলসীদাসের হিন্দী পয়ার, পড়তে পড়তে সে আনন্দে ফুলে ফুলে উঠছিল। হনুমান রাম রাম করতে করতে অলঙ্ঘ্য সমুদ্র পার হয়ে গেল, এই পয়ারটি পড়তে পড়তে সে তুড়ি মেরে এমন আনন্দ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল যে, মনে হল সে-ই বুঝি সেই কৃতী পবননন্দন। তারপর রামায়ণ সরিয়ে রেখে লেজার-বইয়ের মত মোটা লম্বা একখানা খাতা বের করে পাতা ওলটাতে ওলটাতে একজায়গায় থেমে আঙুল দিয়ে বললে, হ্যাঁ, বাঙালী আছে, সাত নম্বর ঘরে। বুঝিয়ে দিল, ওইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দোতলার পাঁচিলের ফোকর দিয়ে যে ঘরখানা দেখা যাচ্ছে, সেইটাই সাত নম্বর। তারপর রেজিস্টারি বন্ধ করে রামায়ণখানা আবার কোলের ওপর টেনে নিল।

ওইখান থেকেই দেখতে পেলাম, সেই ঘরের চটা-ওঠা সবুজ রঙের দরজা ভিতর থেকে ভেজানো অথবা খিল দেওয়া। অন্য সময় হলে হয়তো অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দরজা ঠেঙ্গিয়ে আলাপ করাটা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ মনে করতাম। কিন্তু ধূমপায়ী লোক অনেকক্ষণ তামাক না পেলে ভিতরে ভিতরে যেমন ছটফট করে, বাঙালী সঙ্গের জন্য আমার ভিতরেও ঠিক তেমনি একটা ছটফটানি সঞ্চিত হয়েছিল। দ্বিধা না করে তখনই সিঁড়ি দিয়ে উঠে সাতনম্বর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

একেবারে নিকটে এসে বুঝতে পারলাম দরজাটা ভেজানোই,

খিল লাগানো নেই। বার দুই মৃদু টোকা দিলাম, কোন সাড়া এল না। একটা পাটে সামান্য একটু চিড় ছিল। ঘরে স্ত্রীলোক নেই জানা থাকায় তার উপর চোখ রেখে ভিতরের ব্যাপার বোঝবার চেষ্টা করলাম। পশ্চিমের শীতকাল, তায় বেলা গড়িয়ে গেছে, প্রায় সায়াহ্ন। মেঘে কুয়াশায় রোদ বলতে আর বড় কিছু অবশিষ্ট নেই। সম্ভবত ঘরের ভিতরে কোন জানালাও ছিল না। কাজেই, দৃষ্টিশক্তিকে যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ করেও ভিতরে কে আছেন এবং কি করছেন তা আবিষ্কার করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না।

কিন্তু দৃষ্টি যেখানে ব্যর্থ হল, শ্রুতি সেখানে আমাকে অনেকখানি সহায়তা করল। স্পষ্ট শুনতে পেলাম, ভিতরে কে কাঁদছে। সে কান্না মৃদু এবং চাপা কিন্তু ব্যাকুল। যেন কার নিভৃত মনের গোপন বেদনা দুঃসহ আবেগের তাড়নায় সরব হয়ে ফেটে পড়ছে। সেই কান্নার স্বরে ঠিক কি কথা বেরিয়ে আসছে, তা আমি চেষ্টা করেও বুঝতে পারলাম না। কিন্তু ওই বিদেশে বাঙালী পুরুষমানুষের অমন বুকভাঙা কান্না শুনে নিজের যে কি করা উচিত, তাও স্থির করতে পারলাম না।

ফুটোর ওপর চোখ রেখে মিনিট খানেক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ পাশ থেকে রুক্ষ স্বর শুনতে পেলাম, কি চাই আপনার?

ভয়ানক চমকে উঠলাম, যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছি। প্রশ্নকর্তার দিকে ফিরে পাংশুমুখে বললাম, চাই না কাউকে। দ্বারবানের কাছে খবর পেলাম, আপনারা বাঙালী, তাই একটু আলাপ করতে এসেছিলাম।

কথা শেষ করে আমি নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা সামলে নিলাম। লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর যত রুক্ষ, আকৃতি তত নয়।

বয়স বোধ হল তিরিশ বত্রিশ। চেহারা ফরসা নয়, বরং একটু কালোই ; কিন্তু সুশ্রী আর মোলায়েম। মুখখানা মসৃণ এবং ভারী করুণাব্যঞ্জক, বিশেষ করে চোখ দুটি। পুরুষের অমন স্নিগ্ধ করুণাবর্ষী চোখ আমি সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যেও কম দেখেছি। অমন চেহারায় অত রূঢ় ভঙ্গিমা বেশ কৃত্রিম মনে হল, তাই আশ্চর্য হলাম।

ভদ্রলোক আমার জবাব শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর যেন চেষ্টা করে নিজেকে আরও কঠোর করে প্রায় অভদ্র-ভাবে বললেন, আচ্ছা, সে পরে হবে, এখন আসুন।

বলেই দরজার একটা পাট ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে আবার দরজা ভেজিয়ে দিলেন।

যুগপৎ বিস্মিত এবং দুঃখিত হয়ে আমি দোতলা থেকে নীচে নেমে এলাম।

সেই লোকটার অভদ্র ব্যবহারে আমি শুধু দুঃখিত নয়, বিষম বিরক্তও হলাম। স্থির করলাম, দ্বিতীয়বার আর তার সঙ্গে যেচে আলাপ করতে যাব না। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই রাত্রেই ভোলাগিরি আশ্রমের হোটেলে ভদ্রলোককে আবার দেখতে পেলাম। হরিদ্বারের আরও পাঁচজন বাঙালী যাত্রীর মত তিনিও সেখানে খেতে গিয়ে-ছিলেন। আমি যখন গেছি, তখন পাঁচ-সাতজন আহারে বসেছেন এবং খেতে খেতে সুদূর মাতৃভূমির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্র-নৈতিক হালচাল নিয়ে বিচিত্র আলোচনা করছেন। সেই লোকটিকেও দেখলাম এদের মধ্যে। ভদ্রলোক কথা বলছিলেন কম, খাচ্ছিলেন ধীরে ধীরে। কিন্তু অদ্ভুত মনোযোগের সঙ্গে অন্যান্যের বিতর্ক শুনছিলেন এবং মাঝে মাঝে এক-আধটি সংক্ষিপ্ত উত্তর করছিলেন।

সে মন্তব্য সংক্ষিপ্ত হলেও বেশ অর্থপূর্ণ এবং অন্যান্যের ভাসা ভাসা মতের তুলনায় অপ্রত্যাশিতভাবে চিন্তাগর্ভ !

তাঁর উপস্থিতি বোঝামাত্রই আমি অবন্ধুর মত তীব্র অপাঙ্গে একবার তাঁর দিকে তাকালাম। কিন্তু, আশ্চর্য, সে-দৃষ্টি তাঁর চোখে প্রতিফলিত হল না। বরং, বেশ হাসিমুখেই ভদ্রলোক আমার দিকে একবার চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

আহার করতে করতে মিনিট কয়েকের মধ্যেই উষ্ণ আলোচনার উজানে আমি নিজেও কখন এক সময় ভেসে গেলাম। এবং নানা বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটির পর হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে, আহার-সভার সকলেই তর্ক করছেন আমার বিপক্ষে, আমার স্বপক্ষে লড়ছেন কেবলমাত্র একজন। সে সেই ভদ্রলোক !

অবশেষে খাওয়া শেষ হলে আমরা উঠে পড়লাম। আলোচনায় মতৈক্যের দরুণ আমি ধর্মশালার সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে অদ্ভুত একাত্মতা অনুভব করলাম। আপনাদের অভিজ্ঞতার সমর্থন পাব কি না জানি না, কিন্তু আমার নিজের ধারণা, কেবলমাত্র একটা বিষয়ে মতৈক্যের জমির ওপর মানুষে মানুষে জীবনব্যাপী বন্ধুত্বের বনিয়াদ গড়ে উঠতে পারে।

বেরুবার আগে ভদ্রলোক একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের পুরা আহার শালপাতার ঠোঙায় নিয়ে নিলেন। অনুমান করলাম, বিকালে তাঁদের ঘরে যে লোকটিকে কাঁদতে দেখেছিলাম, সম্ভবত তিনি অসুস্থ, তাই তাঁর খাবার নিয়ে যাচ্ছেন। কান্নার কারণও হয়তো শারীরিক অসুস্থতার যন্ত্রণা ! কিন্তু হোটেল থেকে রুটি তরকারী দুধ প্রভৃতিই নিলেন, রোগীর আহার বলে মনে হল না।

এক ধর্মশালায় ফিরব বলে আমরা পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। আলোচনার জেরে দুই একটা কথা হবার পর আমরা নাম জিজ্ঞাসার

বিনিময় করলাম। ভদ্রলোকের নাম সুরেশ মুখোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গী সম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করলাম না। তিনি নিজেও সে সম্বন্ধে অথবা ব্যক্তিগত কোন প্রসঙ্গই উত্থাপন করলেন না। রাত্রি হয়েছিল অনেক। ধর্মশালায় ফিরে আমি আমার ঘরে চলে গেলাম। সুরেশবাবু দোতলায় উঠলেন।

আগেই বলেছি আহারকালীন আলোচনার সেই স্বল্প সময়টুকুর মধ্যেই আমরা আমাদের পরস্পরের প্রাকৃতিক ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলাম। বাঙলাদেশ থেকে হাজার মাইল দূরে সেই ঐক্য একটা অনিবার্য আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ালো। আগের দিন বিকালের আকস্মিক রূঢ়তার কোন কারণ বা কৈফিয়ত সুরেশবাবু না দিলেও পরের দিন ঘুম ভাঙতেই আমার প্রথম ইচ্ছা হল, দোতলায় গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করা। কিন্তু আমাকে যেতে হল না। শয্যা ত্যাগ করে ওঠার আগেই দরজায় শিকলনাড়ার শব্দ পেলাম। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দেখি সুরেশবাবু দাঁড়িয়ে। গেঞ্জির ওপরেই একখানা ওভারকোট চাপিয়ে নিচে নেমে এসেছেন। আমাকে দেখেই বললেন, কাল বিকালে আপনাকে অভদ্রভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। আজ আপনাকে শোধ নেবার সুযোগ দিতে এসেছি। ইচ্ছা হলে আমাকে চলে যেতে বলতে পারেন।

বললাম, সে কি কথা! নিশ্চয়ই কোন জরুরী প্রয়োজন ছিল, তাই আমার সঙ্গে তখন দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারেননি।

সুরেশবাবু বললেন, প্রয়োজন নয়। আমার যিনি সঙ্গী, তিনি বাইরের লোকের সামনে বড় বিচলিত হয়ে পড়েন। সেইজন্য ও-ঘরে আমি অন্য কাউকে নিয়ে যাই না।

প্রসঙ্গ উঠলেও আমি তাঁর সঙ্গী সম্বন্ধে এবারেও কোন প্রশ্ন করলাম না। কম্বলের ওপর সুরেশবাবুকে বসিয়ে হাত মুখ ধুয়ে

স্টোভে চা করলাম। তারপর ঘণ্টা দুই-তিন গল্প হল। সুরেশবাবু এর মধ্যে মাত্র একবার ওপরে গিয়েছিলেন। সেদিন দুপুর এবং রাত্রি, তারপর আরও দুদিন আমরা প্রায় সর্বক্ষণই পরস্পরের সঙ্গে ছিলাম। এর মধ্যে মাত্র একবার ওঁর সঙ্গীকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম। দুপুরের দিকে তাঁর হাত ধরে সুরেশবাবু শৌচের জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোক সুরেশবাবুর চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড়, সম্ভবত পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবেন। চেহারাটা মাঝারি অথবা একটু মোটার দিকে। হাত-পায়ের গড়ন গোলগাল, গায়ের চামড়া থলথলে। মাথায় অনেক চুল, তেলালো নয়, কিন্তু একেবারে জটা বেঁধেও যায়নি। গোঁফ, দাড়ি একেবারে অযত্নে বেড়ে উঠেছে। মুখখানা পাংশু। গোঁফ, দাড়ি এবং কপালের ওপর ঝুলে-পড়া চুলের ভিড়ের মধ্য থেকে মুখের যেটুকু অংশ স্পষ্ট দেখা যায়, তাতে মনে হয়, লোকটি বুদ্ধিমান হলেও অত্যন্ত সরল। যেন জন্মাবধি কি একটা ভাবের ঘোরে রয়েছে। চোখদুটো ফুলো ফুলো, যেন পিঁপড়ে কামড়েছে। সাধারণ চোখে রুগী মানুষ বলে মনে হয় না। চলার মধ্যেও অস্বাভাবিক অথবা দুর্বলতার পরিচায়ক কিছু নজরে পড়ল না। কিন্তু সুরেশবাবু তাঁকে হাত ধরেই নিয়ে যাচ্ছিলেন।

আমার টিকিটের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছিল। চতুর্থদিন সকাল-বেলা সুরেশবাবুকে বললাম সেদিন ফিরছি। এত তাড়াতাড়ি ফিরব বোধ হয় আশা করেননি। মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বললেন, আপনি বেড়াতে এসেছেন, তাড়াতাড়ি ফিরতেই হবে, কিন্তু আমার এখন যাওয়ার যো নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কি চেঞ্জে এসেছেন?

সুরেশবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করে অল্পক্ষণ চুপ করে রইলেন। সম্ভবত ভেবে নিলেন, এ সম্বন্ধে বেশী কথা ভাঙ্গাটা যুক্তিযুক্ত হবে কি না।

তারপর ভ্রূযুগ আবার স্বাভাবিক করে বললেন, না, চেঞ্জে নয়। কিন্তু ঠিক কি জন্য এসেছি বলতে গেলে আমার সঙ্গীর গোটা জীবন-কাহিনীই আপনাকে শোনাতে হয়।

ব্যস্ত হয়ে বললাম, না না, তার দরকার নেই। আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি, এ সম্বন্ধে আপনার একটা বিশেষ সঙ্কোচ আছে। আমি আপনার দুদিনের আলাপী, আমার কাছে কোন গোপন কথা প্রকাশ করলে হয়তো শেষকালে আপনার আক্ষেপই হবে।

সুরেশবাবু বললেন, গোপন কিছু নেই। সঙ্কোচ করেছি শুধু এইজন্য যে, আগাগোড়া ওর কথা শুনে লোকে হয়তো ওকে বুঝবে না, যা করুণাজনক, তাতে কৌতুক বোধ করবে। তাহলে আমি দুঃখ পাব। ও আমার বিশেষ বন্ধু এবং একমাত্র ভগ্নীর স্বামী। নানা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে দিয়ে গিয়ে ওর আজ যা পরিণতি হয়েছে, সাধারণের কাছে তা দুর্বোধ্য। কিন্তু আপনার সঙ্গে কদিন আলাপ করে আমি বুঝেছি, আপনার বুদ্ধি দরদী। আসুন, হাঁটতে হাঁটতে আমরা ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে যাই। ঘাটে বসে গল্পটা বলা যাবে।

আকাশটা সেদিনও মেঘলা ছিল। রোদ এক-একবার উঠছিল, আবার সাদা সাদা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ছিল। শীত ছিল, কিন্তু তেমন হাড়-বিঁধানো নয়। সুরেশবাবুর গায়ে সেই গেঞ্জির ওপর ওভারকোট। আমি আলোয়ানটা জড়িয়ে নিলাম, তারপর দুজনে মিলে ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে হাঁটা দিলাম।

ভদ্রলোকের হাতের চুরুটটার তখনও কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু বস্তুটার ধূম থেকে বোধ হয় আর তেমন রস পাচ্ছিলেন না। জানালা দিয়ে সেটাকে বাইরে ফেলে দিয়ে সমস্ত মুখখানা বার দুই-তিন হাতের তেলো দিয়ে রগড়ে নিলেন। বোধ হয় মনে মনে

আবার একবার কাহিনীর ক্রম গুছিয়ে নিলেন এবং প্রক্রিয়াটি তারই প্রকাশ।

নন্দগোপাল বললে, মনে হচ্ছে, এতক্ষণে আপনার গল্পের ভূমিকা শেষ হল। আসল গল্প শুনতে হলে তো ঘুমের মায়া একেবারেই ত্যাগ করতে হয় দেখছি।

ভদ্রলোক ঈষৎ হেসে বললেন, বেশ তো, আপনি ঘুমোন। আপনারা সকলেই এখন ঘুমোতে পারেন। কিন্তু বলতে বলতে আমাকে এখন শিল্পীর নেশায় পেয়েছে। শ্রোতা থাক বা না থাক, গল্প এখন আমাকে বলে যেতেই হবে। সুরেশবাবুর উত্তমপুরুষে আমি বলতে পারব না, কারণ, অনেক দিনের কথা, তাঁর ভাষা আমার মনে নেই। বিশেষ, পরমবন্ধু এবং আত্মীয়ের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর কথায় আর স্বরে যে অপূর্ব আবেগ এবং দরদ ঝঙ্কৃত হয়েছিল, তা আর আমি ফিরে পাব না। আমি শুধু আমার ভঙ্গীতে পর পর ঘটনাগুলো সাজিয়ে যাব। এখনও রাতের অনেক বাকী, বেনারস পোঁছুবার আগে আমার গল্প নিশ্চয়ই শেষ হবে।

সুরেশের ভগ্নীপতির নাম নিখিলেশ। সে যখন কলেজে পড়ত, নিখিলেশ তার সহপাঠী ছিল। ওদের প্রাথমিক আলাপ নিখিলেশের স্বভাবগুণে অবিলম্বে অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। ধর্মশালায় তার যে চেহারা দেখেছিলাম এবং একটু আগে বর্ণনা করলাম, সেটা তার প্রথম যৌবনের আকৃতির পরিণত রূপ নয়। প্রথম যৌবনে তার চেহারা একেবারে অন্যরকম ছিল। দেহের গড়ন ছিল একহারা, বলিষ্ঠ, ব্যায়ামপুষ্ট। চোখে ভাবের ঘোর ছিল না, ছিল দুর্জয় বুদ্ধির দীপ্তি। মাথার চুলে জট পড়েনি, জবাকুসুমে

চিকন-ঘন কোঁকড়া চুল সযত্নে পিছন দিকে আঁচড়ানো থাকত। তার পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যে বাবুয়ানা ছিল না, কিন্তু সে যাই পরুক, স্যুট কি সিল্ক, অথবা শুধু মোটা ধুতির ওপর সাদা লংক্লথের পাঞ্জাবি, তাতেই তাকে আশ্চর্য মানাত এবং সুন্দর দেখাত।

তার চলন বলনের মধ্যে একটা তীব্র বেগ ছিল যা দেখে অনেকে মনে করত, ছেলেটা বুঝি প্রচণ্ড রকমের বহির্মুখী। সে চলত লম্বা লম্বা পা ফেলে, কথা বলত তেড়ে তেড়ে, লোকের সঙ্গে মিশত শুরু থেকেই বন্ধুত্বের রং চড়িয়ে। যেখানে যেত, যে মজলিসেই দুদণ্ডের জন্য আড্ডা গাড়ত, সেখানেই নিজের সতেজ, সানন্দ ব্যক্তিত্বে একটা মিষ্টি ছোঁয়াচ ছড়িয়ে আসত। কোন দুঃখ তাকে টলাতো না, কোন অভাব তাকে ভাবাতো না, কোন আনন্দ তার কাছে অত্যন্ত নীচ মনে হত না। রেসের মাঠে, মদের মজলিসে, রাজনীতির গুপ্তচক্রে অথবা ব্যায়ামবীরের আখড়ায় তার সমান গতিবিধি ছিল। যারা স্থিরবুদ্ধি ও প্রৌঢ়মনা, তারা মনে করত, এ বুঝি পাখা-ওঠা পিঁপড়ে, দশদিনেই দশবছরের বাঁচা বেঁচে নিতে চায়, এ বুঝি আধুনিকের এক দুঃসাহসী অগস্ত্য, জীবন-বারিধির সমস্তটুকু জল এক আঁজলায় গুটিয়ে এনে নিঃশেষে পান করে নিতে চায়। তার উচ্ছলতায় তারা চমকে যেত, ভয় পেত, কিন্তু তবু তার প্রাকৃতিক উষ্ণতার তাপে নিজেদের শীতল সত্বাকে মাঝে মাঝে গরম করে নেওয়ার লোভও দমন করতে পারত না।

কিন্তু তারা ভুল করত। নিখিলেশের মূল প্রকৃতির সন্ধান যে কয়জন পেয়েছিল, সুরেশ তাদের অন্যতম। কিন্তু প্রথম কয়দিনের আলাপে সেও তাকে চিনতে পারেনি। সুরেশ বুদ্ধিপ্রধান হলেও সে বরাবর ধীর, স্থির, সংযত ও সাবধান প্রকৃতির মানুষ। প্রথম প্রথম অন্য অনেকের মত সেও নিখিলেশকে প্রগল্ভ ও চঞ্চল বলে ধরে

নিয়েছিল। একদিন কলেজের একদল ছেলের সঙ্গে ওরা দুজনে বরাহনগরে একটা বাগানে পিক্‌নিক করতে যায়। সেখানেই নিখিলেশ সম্বন্ধে সুরেশের ধারণা বদলায়।

জন পঁচিশেক ছাত্র ছিল। সকলেই তরুণ। জীবনীশক্তি আপনাদেরই মত চঞ্চল ও উচ্ছল। প্রচণ্ড হৈ-রৈ, অকারণ অট্টহাসি। বেসুরো গান এবং একে অন্যের পিছনে লাগা,—পিক্‌নিকের শুরু থেকে শেষ অবধি এই নিয়েই কাটল। গোড়ার দিকে ওদের আনন্দের প্রধান খোরাক যোগাচ্ছিল নিখিলেশের তীক্ষ্ণ হাস্য-কৌতুক। তার পর কতক্ষণ পরে এক সময় দেখা গেল নিখিলেশ নেই। অত বড় একটা পুরু ছাত্রসমাবেশে একজনের অনুপস্থিতি খুব মাথা ঘামাবার মত নয়, কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামালোও না। কেবল সুরেশ, যখন মধ্যাহ্ন-ভোজনের আগে একদফা ডিমের অমলেট এবং চা পরিবেশন হচ্ছে, তখন লক্ষ্য করল, দলে নিখিলেশ নেই। তখনও নিখিলেশের প্রতি সুরেশের কোন বিশেষ প্রীতি বা পক্ষপাত জন্মায়নি। তবুও তার মনে হল, সে সরে যাওয়ায় ছেলেদের গোলমালের মধ্যে, যেটুকু বা আনন্দের ভাগ ছিল, সেটুকুও উবে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা নির্বোধ ও উন্মত্ত কোলাহলে দাঁড়িয়েছে। ভিড়ের মধ্যে তার আর একদণ্ডও ভাল লাগছিল না। এক সময় নির্জন হবার জন্য সে সকলকে এড়িয়ে বাগানের ভিতর ঢুকে পড়ল।

ধনীর সাজানো বাগান। চারিদিকে ইঁটের খাঁদরিকাটা রাঙা সুরকি-ঢালা সরু সরু পথ চলে গেছে। আম, জাম, আনারস, নারিকেল, কলা প্রভৃতি গাছ উচ্চতা ও বেড় অনুযায়ী সুন্দর পরিকল্পনা করে সাজানো। হেমন্তের মধ্যদিন। সূর্যের তাপ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু পথে দশ বার হাত অন্তর বড় বড় গাছের পাতার ঘন ঝিলিমিলি থাকায় রোদ অসহ্য হচ্ছিল না। কিছুক্ষণ অলস

পাদ-চারণার পর সুরেশ একটা নিমগাছের ছায়ায় কাঠের বেঞ্চে বসল। বসামাত্রই তার নজরে পড়ল, অদূরে একটা আমগাছের কাণ্ডের আড়ালে আরও একজন কে বসে আছে। তার শরীরটা দেখা যাচ্ছে না, কেবল দেখা যাচ্ছে হাতের সমুখভাগ আর একখানা লম্বা পকেট-বই। সেই পকেট-বইয়ের পাতায় সে দ্রুত কি লিখে যাচ্ছে। হাতের ফরসা রং আর মধ্যমায় শাঁখের আংটি দেখে সুরেশের বুঝতে দেরী হল না, সে নিখিলেশ। সুরেশ ভারী আশ্চর্য হল। এই দুপুরে আড্ডা, হৈ-রৈ, চা ও হাস্য-কৌতুক ছেড়ে নির্জন আমের ছায়ায় বসে পকেট-বই খুলে নিখিলেশ কি প্রেম-পত্রের খসড়া করছে? কলেজ এবং কলেজের বাইরে দু'একজন তরুণীর সঙ্গে নিখিলেশের ঘনিষ্ঠতার সংবাদ গুজবরূপে সুরেশের কানে এসেছিল বটে, কিন্তু সে বিশ্বাস করেনি। নিখিলেশ আবেগপ্রবণ হলেও প্রেমপ্রবণ ছেলে বলে সুরেশের ধারণা ছিল না। তখনকার মত সুরেশ তাকে বাধা দিল না। অল্পক্ষণ বেঞ্চে বসে আবার একবার বাগানময় পায়চারী করল, কিন্তু শেষ অবাধ কৌতূহল দমন করতে পারল না। বেড়াতে বেড়াতে এক সময় নিখিলেশের পিছনে এসে দাঁড়ালো। এবার দেখল, শুধু নোট-বই নয়, নিখিলেশের বাঁ-পাশে একখানা অনতিপুরু ইংরাজী বইও খোলা আছে।

নিখিলেশ তখনও লিখে চলেছিল। নোট-বইয়ের ওপর সুরেশের শরীরের ছায়া পড়তে মুখ তুলে তাকালো। এক মুহূর্ত তার মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠলো, তারপর ঈষৎ হেসে বললে, বস। রান্না সারা হয়ে গেছে বুঝি?

বসতে বসতেই সুরেশ লক্ষ্য করল—নিখিলেশের মুখখানা আশ্চর্য সৌম্য ও প্রশান্ত দেখাচ্ছে। অথচ ও যখন পাঁচজনের মধ্যে থাকে, তখন একটা বুদ্ধির দীপ্তি বাদ দিলে মনে হয়, ও নিতান্ত লঘুচেতা।

বললে, না, রান্নার দেরী আছে। এমনি ঘুরতে ঘুরতে এদিকটায় এসে পড়লাম। পিক্‌নিক করতে এসে তুমি যে পরীক্ষার পড়া তৈরী করায় ব্যস্ত থাকবে, তা ভাবিনি। একটু লজ্জিত হচ্ছি।

নিখিলেশ বললে, পরীক্ষার পড়া তো নয়।

তবে?

খোলা বইখানার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে সুরেশ নামটা পড়ে নিল, 'পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'।

নিখিলেশ বললে, দর্শন তো আমার সবজেক্ট নয়। আসবার সময় হুইলারের স্টলে বইটা দেখতে পেলাম। একটা অধ্যায়ের শিরোনামা দেখে মনে হল কাজে লাগবে। কিনে নিলাম, সেইটাই একটু নোট করছিলাম।

সুরেশ বললে, বাড়ী যাওয়া অবধি তর সইল না! দর্শন সম্বন্ধে তোমার এই অসাধারণ কৌতূহলের সংবাদ আগে জানতাম না।

নিখিলেশ হাসল। পাঁচজনের মধ্যে থাকলে যেমন উচ্চরবে হাসে, তেমন নয়, নিঃশব্দে। বললে, কৌতূহল নয়, গবেষণা।

গবেষণা? কি নিয়ে?

উত্তর দিতে গিয়ে নিখিলেশের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। একটা গাঢ় বিষাদের ছায়া নামল তার মুখের উপর। বললে, নাস্তিক্যবাদ।

সুরেশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিখিলেশের চোখের ওপর পড়ল।

তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর না?

না। ঈশ্বরে না, আত্মায় না, ধর্মে না, আমাদের পাঁচ ইন্দ্রিয় দিয়ে বোঝা যায় না, এমন কোন জিনিসে নয়। আমার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি এই অবিশ্বাস জড়ানো।

নিখিলেশের উক্তির আন্তরিকতা সুরেশকে স্পর্শ করল। বললে, বিশ্বাস আমিও করি না, কিন্তু জোর করে অবিশ্বাস করতেও সাহস

পাই না। সৃষ্টির এই বিশাল ভোজবাজীর মধ্যে কতটুকু সত্যি, কতটুকু মিথ্যে, তা কেমন করে বুঝব ?

নিখিলেশ ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বললে, কেমন করে বুঝব কি ? তুমি আছ, তোমাকে দেখে বুঝছি তুমি আছ। তুমি না থাকলে তোমার সেই না থাকা থেকেই বুঝব তুমি নেই। যাকে দেখতে পাই না, তাকে দেখতে পাই না বলেই বুঝি সে নেই। এর মধ্যে ভোজ-বাজীর তো কোন কথাই ওঠে না।

দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনায় সুরেশের কোন আগ্রহ ছিল না, তাই সে এ কথার কোন প্রত্যুত্তর করল না। কিন্তু নিখিলেশের গভীরতর সত্তার আকস্মিক প্রকাশে সে নিজের মনে মনে একটা মৃদু উত্তেজনা অনুভব করল। অদূরের বাগানবাড়ী থেকে ছেলেদের মিশ্রকণ্ঠের ছন্দহীন চিৎকার ভেসে আসছিল। সুরেশের মনে হল, ওই সব সহপাঠীদের থেকে নিখিলেশ অনেক শ্রেষ্ঠ। যারা গতানুগতিক নয়, যারা চলিত পন্থা থেকে চিন্তায় বা কাজে সরে দাঁড়াতে পারে, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার নেশা সুরেশের বৈশিষ্ট্য। কৌতূহলের সঙ্গে সঙ্গে নিখিলেশ তার মনে শ্রদ্ধা ও দরদও জাগাল।

অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে সুরেশ বললে, তুমি যে এ সব নিয়ে চিন্তা কর, তা তোমার সাধারণ আচার ব্যবহার থেকে বোঝা যায় না।

নিখিলেশ বললে, কেমন করে বোঝা যাবে ? যে ঐহিক সৃষ্টিকেই সৃষ্টি-রহস্যের আদি ও অন্ত বলে মনে করে, তার আচার-ব্যবহার আগাগোড়া ঐহিক ছাড়া আর কি হবে ? কিন্তু সম্প্রতি বিষয়টা আমার মাথায় এমন চেপেছে যে, লোকের কাছে না বলে থাকতে পারছি না। তাই এর স্বপক্ষে বিপক্ষে যত যুক্তি আছে, পড়ে শুনে সব জেনে নিচ্ছি।

সেদিন আর অধিকক্ষণ কথা হয়নি। একটু পরেই খাবার তৈরী

হওয়ায় ছেলেদের দল হৈ-রৈ করে এসে ওদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরে, নিখিলেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হলে, তার নাস্তিক্যবাদের শুরু কোন্‌খানে, সে বিবরণ সুরেশ জেনে নিয়েছিল। অবশ্য কেবল একটা ঘটনা একজন মানুষের মনে কোন বিশেষ তত্ত্বে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস এনে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তবু সামান্য আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় কি অনেক সময় আমাদের অবচেতন সত্তা সচেতনের পর্যায়ে উঠে আসে না?

ঘটনাটা এই। নিখিলেশের এক জ্যাঠামহাশয় ছিলেন, তিনি সন্ন্যাসী। বছরের অধিকাংশ সময় মঠে থাকতেন। কিন্তু মাঝে মাঝে দু'একমাস বাড়ীতে এসেও বাস করতেন। ভদ্রলোক ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী এবং গম্ভীর প্রকৃতির। কথা বলতেন কম, হাসতেন অত্যন্ত কদাচিৎ এবং একেবারে মনে মনে জপ হত না বলে তাঁর ঠোঁট দুটো নিঃশব্দে ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণের দরুণ প্রায়ই একটা বিশেষ ভঙ্গীতে নড়ত। তাঁর চেহারা ছিল ছ'ফুট লম্বা এবং সেই অনুপাতে চওড়া। গোঁফ, দাড়ি এবং মাথা থাকত কামানো এবং বাল্যকালের একটা আঘাতের দরুণ তাঁর ডানদিকের ভ্রূর ঠিক ওপরেই একটা বিশ্রী কুঞ্চিত ক্ষতচিহ্ন ছিল। সেই দশাসই চেহারা, সেই অনুক্ষণ ঠোঁটনাড়া এবং মুখের সেই বীভৎস ক্ষতচিহ্নের দরুণ প্রাপ্তবয়স্কেরা তাঁকে দেখা-মাত্রই সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করলেও শিশুরা তাঁর কাছে বড় ঘেঁষত না। এবং দৈবের ফেরে কখনও সামনে পড়লে লম্বা জিভ কেটে মা বা মাসীর পিছনে আত্মগোপন করত।

নিখিলেশের বাবা ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর স্বভাবটা ছিল মৃদু প্রকৃতির; অথবা, যেটুকু কঠোরতা ছিল, তার সবখানিই ব্যবসার শৃঙ্খলারক্ষায় খরচ হয়ে যেত। সংসারে তিনি থাকতেন টিফিন-পিরিয়ডের হেডমাস্টারের মত। একেবারে অঘটন না ঘটে, সেদিকে

একটা হাল্কা নজর রাখতেন, কিন্তু ছেলেরা জানত ছুটি। সেই আনন্দ আর স্বাধীনতার হাওয়ায় ছেলেরা দিব্যি নেচে কুঁদে বেড়ে উঠতো। তাদের বিভীষিকা ছিল শুধু সেই জ্যাঠামশায়। তিনি এলে ছেলেদের ওই নাচন কোঁদন দেখামাত্রই তাঁর ডান দিকের ভ্রূর সেই ক্ষতচিহ্নের পাশেই একটি তীব্র ভ্রূকুটী ফুটে উঠতো। অবিলম্বে তিনি কতকগুলি নিয়মের বেড়াজাল পেতে ছেলেদের স্বাধীনতায় একটি সঙ্কীর্ণ সীমারেখা টেনে দিতেন। মরুক বা বাঁচুক। ছেলেদের সেই নিয়মগুলি মানতেই হত। জ্যাঠামহাশয়ের আদেশের ওপর কোন আপীল ছিল না।

নিয়মগুলির মধ্যে কেবল একটিমাত্রই এখানে প্রাসঙ্গিক। সেটি এই। নিখিলেশদের চারতলার ওপর একটি ঠাকুরঘরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ ছিল। প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠে ছেলেদের প্রথম কাজ ছিল, চারতলায় উঠে সেই ঠাকুরঘরের দরজার চৌকাঠে তিনবার মাথা ছুঁইয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বিগ্রহকে নমস্কার করা। কাজটা এমন কিছু কঠিন নয়। প্রত্যূষে ওঠা ছেলেদের সহজ অভ্যাস ছিল। কিন্তু নিয়মের অসাধারণ কঠোরতাই তাদের বিদ্রোহী করে তুলত। যতদিন জ্যাঠামহাশয় থাকতেন, পাঁজির একটি দিন, একটি তিথিও বাদ দেবার যো ছিল না। শয্যা ছেড়ে উঠে হয়তো ছেলেদের সর্বপ্রথম ইচ্ছা হত, পরস্পরের সঙ্গে পল্টনী ঢং-এ বেশ এক প্রস্থ দাঙ্গা করে নিই, অথবা আগের না-শেষ হওয়া শিশু-সাহিত্যের কোন গল্পকে দুই তিন গ্রাসে গিলে নিই, না হয় তো সাম্প্রতিক ক্রিকেট সংবাদ সম্বন্ধে পাশের বাড়ীর সহপাঠীর সঙ্গে একটা আলোচনা সেরে নিয়ে তারপর ঠাকুর নমস্কারে যাই। বাবার কর্তৃত্বে এসব অত্যন্ত সহজ হয়। কিন্তু জ্যাঠামহাশয় থাকতে একটি দিনের জন্যও এসব তুচ্ছ ব্যতিক্রমকে প্রশ্রয় দেওয়ার উপায় ছিল না। ছেলেরা নিশ্চয়

জানত, জ্যাঠামহাশয় এলেই এ বাড়ীর দেওয়ালের কান হয়, দরজা জানালার কান হয়, নল-কল চৌবাচ্ছার কান হয়, হাঁড়ি, কলসি, তৈজস—বাড়ীর ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় জড় বস্তুই উদ্যতকর্ণ হয়ে ওঠে। তারা সবাই জ্যাঠামহাশয়ের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। জ্যাঠা-মহাশয়ের আড়ালেও কোনপ্রকার নিয়মভঙ্গ হলে তিনি এই সব ষড়যন্ত্রীদের কাছে সংবাদ পাবেনই। তখন জ্যাঠামহাশয়রূপ সেই বিশাল আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়বে এবং তার উষ্ণ লাভাপ্রবাহে তারা দগ্ধ হয়ে ভেসে যাবে।

সকলেই এই ভয়ের কাছে মাথা নোয়াত, ফাঁকি দিতে চাইত শুধু নিখিলেশ। শৃঙ্খলকে বাজীকরের মত এড়িয়ে যাবার লোভটা তার চিরকাল। জ্যাঠামহাশায় একটু অন্যমনা, একটু অসতর্ক থাকলেই সে আর সেদিন চারতলায় উঠতো না এবং সারাদিন বালকের মতই সেই ফাঁকির আনন্দকে উল্টে পাল্টে উপভোগ করত। কোনদিন এ বিষয়ে জ্যাঠামহাশয় প্রশ্ন করলে সে ঘাড় নেড়ে অনায়াসে মিথ্যা জবাব দিত যে, হ্যাঁ, রোজকার মত সেদিনও সে যথারীতি বিগ্রহ নমস্কার করেছে।

বলা বাহুল্য, এই লুকোচুরির খবর অনেক সময়ই জ্যাঠামহাশয়ের কানে পৌঁছাতো এবং দশ-এগারো বছর বয়সের বালকের এই অসীম ঔদ্ধত্য তাঁকে অসাধারণ তাতিয়ে তুলত। অবশ্য এমন অবস্থা ঘটলেই তাঁর ঠোঁটনাড়ার বেগ বেড়ে যেত, ধ্যানের সময় দীর্ঘ হত এবং ছয় রিপুর অন্যতম যে ক্রোধ, তাকে দমন করার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করতেন। ঠিক এই কারণেই তিনি নিখিলেশকে তখনই তখনই কোন দণ্ড দিতেন না। কেবল তাঁর ওপর নজরটা আরও তীক্ষ্ণ করতেন। কিন্তু একদিন জ্যাঠামহাশয়ের মতি বদলে গেল।

সেদিন নিখিলেশের একটা সাঁতারের প্রতিযোগিতায় যোগ

দেবার কথা ছিল। ভোরবেলা তার বন্ধুরা এসে ডাকল। নিখিলেশ হাত মুখ ধুয়ে আড়ে দেখে নিল জ্যাঠামহাশয়ের ঘরের দরজা বন্ধ এবং ভিতরে তিনি নিবিষ্টমনে তাঁর একটি কীটদষ্ট ধর্মগ্রন্থের পাতা উল্টাচ্ছেন। আর চারতলায় ওঠার ধৈর্য রইল না নিখিলেশের। কস্টিয়ম এবং তোয়ালে একটা কাগজে মুড়ে বগলে নিয়ে সিঁড়ির প্রথম কয়েকটি ধাপের ওপর বারকয়েক জোরে জোরে পদশব্দ করল, যেন সত্যই ছাদে উঠছে। তারপর চুপি চুপি পা টিপে টিপে নিচে নেমে গেল।

ঘরের মধ্যে জ্যাঠামহাশয়ের মুখখানা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ করে নিখিলেশ যে মিথ্যা করে বোঝাতে চায় যে, সে চারতলায় যাচ্ছে, এ সংবাদ তিনি রাখতেন। বই বন্ধ করে তিনি সেলফের ওপর রেখে দিলেন, তারপর বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তিনটে ধাপের পরে আর কারও পায়ের চিহ্ন নেই। জ্যাঠামহাশয়ের সমস্ত মুখখানা রাঙা হয়ে উঠলো। ঘরের মধ্যে ফিরে এসে মেঝের ওপর পায়চারী করতে লাগলেন। আজ আর ক্রোধ দমনের কথা তাঁর মনে উঠলো না। বরং মনে হল, ঈশ্বর শুধু পালন কর্তাই নয়। শাসনকর্তাও। নিয়ম ভঙ্গের প্রশ্রয় পেয়ে নিখিলেশের ভবিষ্যৎ যদি নষ্ট হয়ে যায়, সে দায়িত্ব তাঁরই। আজ তাকে দণ্ড দিতেই হবে। অনেকদিন পরে নিখিলেশকে শাসন করার একটা ধর্মানুমোদিত অজুহাত পেয়ে জ্যাঠামহাশয়ের শরীরের লোমগুলো একটা নিষ্ঠুর আনন্দে সিধা হয়ে উঠলো। একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ায় তাঁর অনেকদিনের অভ্যাস ঠোঁটনাড়া, সেও তখন বন্ধ হয়ে গেল।

ঘণ্টা আড়াই পরে নিখিলেশ ফিরল। সাঁতারে সে প্রাইজ পেয়েছে। কাপড় ছেড়ে, চুল আঁচড়ে, মুখ মুছে সেই আনন্দ-সংবাদ

বাড়িতে প্রচার করতে যাচ্ছিল, এমন সময় জ্যাঠামহাশয় ডাকলেন, নিখিলেশ! সে তো ডাক নয়, সে যেন চার অক্ষর দিয়ে তৈরী একটা ধ্বনিময় ভয়! সেই ভয় নিখিলেশের শরীরযন্ত্রের ভিতর প্রবেশ করে তার ত্বক থেকে সমস্ত রক্ত শুষে নিল। যখন সে জ্যাঠা-মহাশয়ের কাছে পৌঁছাল, তখন তার মুখখানা মড়ার মত সাদা আর দেহটা অত্যন্ত স্থির।

জ্যাঠামহাশয়ের স্বর অসাধারণ স্থির এবং গম্ভীর। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আজ ঠাকুরঘরে গিয়েছিলে?

নিখিলেশ আজ কিছুতেই মিথ্যা বলতে পারল না। অস্ফুট স্বরে জবাব দিল, না।

তার ডান হাতের কব্জীটা নিজের হাতের মধ্যে ধরে জ্যাঠামহাশয় বললেন, এস।

নিখিলেশের তখন নিজের কোন ইচ্ছা নেই, গতি নেই। জ্যাঠা-মহাশয় তাকে একরকম টেনে নিয়ে গেলেন ছাদের ওপর।

ঠাকুরঘরের সামনে এসে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে জ্যাঠামহাশয় নিখিলেশের ঘাড়টা বাঁ হাত দিয়ে ধরে বললেন, নমস্কার কর।

নিখিলেশ জ্যাঠামহাশয়ের মুখের দিকে নির্বোধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জড়ের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তখন বেলা হয়েছে। সূর্য আকাশের প্রায় মধ্যখান অবধি এসে পৌঁছেছে। সমস্ত পৃথিবী কর্মচঞ্চল। নিকটের রাজপথ থেকে ট্রামের ঘড়ঘড় শব্দ ভেসে আসছে, শোনা যাচ্ছে মোটরের ভেঁা, একতলার ঝিটা কলের সবখানি খুলে দিয়ে ঘস ঘস করে বাসন মাজছে, সে শব্দ নিখিলের ধ্বনিপুঞ্জে মিশে যাচ্ছে। রেডিওর তার-খাটানো বাঁশের ওপর একটা দীর্ঘ চঞ্চু কাক থেকে থেকে কা কা শব্দ করে যেন কর্মচঞ্চল জগতের সঙ্গে তাল রেখে নিজেরও কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে। কিন্তু চারিদিকের

এই অস্থির প্রাণবত্তা যেন কেবল জ্যাঠামহাশয়ের ভয়ে নিখিলেশের কাছ অবধি এসে পৌঁছুতে পারছে না। কেবল সেইখানটাই অত্যন্ত নীরব, অত্যন্ত ভয়ানক, অত্যন্ত অন্ধকার।

নিখিলেশকে চুপ করে থাকতে দেখে জ্যাঠামহাশয় মনে করলেন তার তেজ তখনও ভাঙেনি। তিনি চীৎকার করে উঠলেন না বা রাগের কোন উচ্ছৃঙ্খল প্রকাশই করলেন না। শুধু তাঁর আঙুলগুলো বাঘের থাবার মত নিখিলেশের ঘাড়ে চেপে বসল। তারপর আস্তে আস্তে ঘাড়টা নুইয়ে চৌকাঠের ওপর জোরে জোরে ঠুকে দিলেন, একবার নয়, বেশ তালে তালে তিনবার, যেন নিখিলেশের কপাল দিয়ে চৌকাঠের ওপর হাতুড়ীর কাজ করলেন।

উঠে দাঁড়ালে বললেন, এইবার হাত জোড় করে নমস্কার কর।

যন্ত্রের পুতুলের মত নিখিলেশ হাতজোড় করে কপালে ঠেকাল। তার কপালটা তখন তখনই ফুলে লাল হয়ে উঠেছে। সে কাঁদল না। শুধু তার মনে অন্ধকারের স্তরটা যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠল। আর সেই উৎপীড়িত মনের কোন খেয়ালী কল্পনায় তার স্পষ্ট বোধ হল, ঘরের মধ্যে ধূপ-ধুনার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আবছা ওই যে শ্রীকৃষ্ণের পাথরে গড়া বিগ্রহ, ওর বেঁকানো কপালে ভ্রূর ঠিক ওপরেই একটা কুঞ্চিত ক্রূর ক্ষতচিহ্ন দেখা যাচ্ছে, অবিকল জ্যাঠামহাশয়ের মত।

জ্যেঠামহাশয় বললেন, প্রত্যেকদিন সকালে এইভাবে ঠাকুরকে নমস্কার করবে। রোজ। বাদ যাবে না একদিনও। এখন যাও।

নিখিলেশ নেমে এল। এরপর কপালের ফুলো নিয়ে সে কতখানি কষ্ট পেয়েছিল, কদিন ভুগেছিল, সে কথা অবান্তর। কিছুদিন বাদে জ্যাঠামহাশয় সেবারকার মত মঠে চলে গেলেন। নিখিলেশের মনে এই ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রভাবও আর বেশীদিন রইল না। কেবল,

মানুষ যেমন সাপকে ঘৃণা করে, জ্যাঠামহাশয়ের প্রতি তেমনি একটা অপরিসীম ঘৃণা তার সত্তার সঙ্গে সারাজীবনের মত মিশে গেল। শুধু জ্যাঠামহাশয়ের প্রতি নয়, ঠাকুর, দেবতা, ঈশ্বর, ধর্ম, পূজা, জপ, —এ সকলের প্রতিও বুঝি, কারণ জ্যাঠামহাশয়ের সঙ্গে এদের একটা অশুভ মৈত্রীর সংশয় বালকের মন থেকে অনেকদিন অবধি ঘুচতে চায়নি।

এই অবধি বলে ভদ্রলোক একটু বিরাম নিলেন। ওপাশের একটা ছোট সোরাই থেকে গ্লাসে জল ঢেলে ঢক ঢক করে পান করলেন। বেশ গোছালো অভ্যাসের মানুষ। ভ্রমণের জন্য টুকিটাকি যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তুই সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন, কোনটাই ভুল হয়নি।

ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ঢুলছিল। কেবল গিরিন মন দিয়ে শুনছিল। বললে, তাহলে এই উৎপীড়নই নিখিলের নাস্তিক্যবাদের মূল।

ভদ্রলোক চুরুটটা আবার হাতে তুলে নিয়ে বললেন, সুরেশবাবুর তাই ধারণা। তবে নিখিলেশ নাকি তা স্বীকার করত না। সে বলত, এই ঘটনার ফলে তার কচি বয়সেই আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসা বোধ জাগে বটে, তবে অবিশ্বাসটা তার নিজের বিচার বুদ্ধির ফল।

নন্দগোপাল তন্দ্রা ভেঙ্গে যাওয়ায় উঠে বসল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললে, গল্প শেষ হয়ে গেল ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, না এইবার শুরু হবে।

নন্দগোপাল বললে, তাহলে বলুন। এখন থেকে আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনব।

ভদ্রলোক চোখ বুঁজে চুরুটে দুটো একটা বড় টান দিয়ে মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া বার করে আবার বলতে শুরু করলেন।

বাগানে সুরেশের সঙ্গে সেই আলোচনার কয়েক মাস পর থেকেই নিখিলেশ কথা অনুযায়ী কাজ শুরু করল, অর্থাৎ নাস্তিক্যবাদ সম্বন্ধে নিজের মতামত ছাদের চিলকোঠার ওপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করে জনসমাজকে শোনাতে লাগল। সে যে এ সম্বন্ধে গবেষণামূলক কোন বিরাট গ্রন্থ লিখে ফেলল তা নয়। তার স্বভাবে ধৈর্য কম, অভিনিবেশ বেশী; ভার কম, ধার বেশী। অল্পকাল অশেষ শ্রমের দ্বারা যা পাওয়া যায়, তা সে পায়; সুদীর্ঘকাল নিয়মিত সাধনার দ্বারা যা লভ্য, তা লাভ করা তার সাধ্যাতীত। সে টুকরো টুকরো প্রবন্ধ লিখে ফেলল অনেক। তামাম ভারতবর্ষের ছোট বড়, ধর্মমূলক না-ধর্মমূলক পত্রিকাগুলোয় ঘরের কড়ি খরচ করে লেফাপা এবং টিকিট কিনে সে সব লেখা পাঠাতে লাগল। কেউ ছাপল, অনেকে ছাপল না। ভারতবর্ষ তখন ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামানো ছেড়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে ডুব দিয়েছে। কেশব সেন, দয়ানন্দ সরস্বতী বক্তৃতামঞ্চ ছেড়ে দিয়েছেন তিলক, গোখেলকে। কিন্তু নিখিলেশ দমল না। বোধ হয়, কাঁচা বয়সের উৎসাহে সে মনে করেছিল সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে তার মতো মৌলিক মতবাদ পূর্বে আর কেউ জগতকে শোনায়নি। মনে করেছিল, সেই মতবাদ লোককে না জানালে একটা মহৎ কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করবে। ঘরে বাইরে, ট্রেনে ট্রামে, পুরুষের আড্ডায়, মেয়েদের মজলিসে,—যেখানে যে আলোচনাই হোক, নিখিলেশ থাকলে নিশ্চয়ই তার মোড় ঘুরে দাঁড়াতো সৃষ্টিতত্ত্বের তর্কে এবং সে জ্বলজ্বলে চোখে হাত-পা উৎক্ষিপ্ত করে অন্য সকলের কণ্ঠস্বর দাবিয়ে

নিজের সিদ্ধান্তটি জানিয়ে দিত যে, এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্বেও কিছু ছিল না, পরেও কিছু থাকবে না, ইহ সংসারে যা কিছু দেখা যাচ্ছে সমস্তই প্রাকৃতিক, আকস্মিক যোগাযোগের ফল এবং অস্থায়ী, এই অস্থায়িত্ব সত্য এবং এই সত্যটুকু থেকে যতখানি সম্ভব রস নিংড়ে নেওয়াই বুদ্ধিমান মানুষের কাজ। তার মুখ থেকে এই সব বয়সের অনুপযোগী মতামত শুনে বন্ধুরা ভাবত, ক্ষেপেছে, মেয়েরা ভাবত, পেকেছে ; বুড়োরা ভাবত অকালে পেকেছে। কিন্তু পরের ভাবনার চেয়ে নিজের ভাবনা নিয়েই সে তখন বেশী ব্যস্ত। শিশু-সাহিত্যের অপূর্ব সৃষ্টি শ্বেত নাইটের মত সে তখন পগারের মধ্যে পড়লেও বোধ হয় হাত নেড়ে চীৎকার করে বলত, ঈশ্বর নেই, ধর্ম নেই, আত্মা নেই।

মানুষের বিশ্বাস যতক্ষণ কেবল মতের মধ্যেই ডেরা বেঁধে থাকে, ততক্ষণ এক রকম ; কন্তু যখন মতের গণ্ডী ছাড়িয়ে সেই বিশ্বাস মগজের মধ্যে স্থায়ী আসন নেয়, যখন মানুষের চিন্তা, কাজ, কথা, এমনকি,—খেয়াল খুসি ও স্বপ্নগুলোকে অবধি নিজের রঙে রঞ্জিত করতে থাকে, তখন তার শক্তি বড় ভয়ানক। তখন মানুষটা হয়ে দাঁড়ায় সেই বিশ্বাসেরই প্রতীক। তখন কোন সঙ্গ কোন হিতোপদেশ, কোন প্রভাবই আর তাকে সেই বিশ্বাসের খোল থেকে বের করে আনতে পারে না।

সারাক্ষণ নাস্তিক্যবাদ নিয়ে চিন্তা করে নিখিলেশের ক্রমে এই অবস্থা হল। যে সৃষ্টির মধ্যে সকল কিছুই নশ্বর, কাঁচা, তাসের ঘরের মতই ভঙ্গুর, যার পিছনে কোন উদার ও মহৎ শিল্পীর উদ্ভাবনা প্রতিভা নেই, তাকে নিয়ে মানুষ কোন্ মোহে এত মাতামাতি করে। এই সুকৌশল সমাজ ব্যবস্থা, এই নৈতিক বিধি-নিষেধের টানা-পোড়েন, সুশৃঙ্খল সমষ্টি-জীবনের খাতিরে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারে

কেবলই হস্তক্ষেপ—কি অর্থ এ সবের ধোপে যদি কিছুই না টেঁকে? জড়ই কি, চেতনই কি—কেবল অণু পরমাণুর যোগে আর বিয়োগে যে সৃষ্টির স্থিতি এবং লয়, সেখানে দিনকয়েকের জন্য অনিমন্ত্রিত অতিথির মত এসে ধীর, স্থির, বিধিবদ্ধ ও পরিকল্পিত জীবন যাপনের কিছুমাত্র অর্থ আছে?

নাস্তিক্যবাদের টানে নিখিলেশ ক্রমেই শান্ত, সংযত, ভদ্র জীবনে নিরাপদ আশ্রয় থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। মদ ও আনুষঙ্গিক দোষগুলোর ওপর সুরেশের কোন সাংস্কারিক বিদ্বেষ ছিল না। দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তিকর একঘেঁয়েমি থেকে মাঝে মধ্যে সরে আসার জন্য হয়তো বা এগুলোর কিছু প্রয়োজনও আছে। কিন্তু ইদানীং নিখিলেশের কাণ্ড দেখে মনে হত যেন উচ্ছৃঙ্খলতা চরিতার্থ করবার জন্যই সে জন্মেছে। যে সব সঙ্গীদের মধ্যে ইদানীং তাকে সর্বক্ষণ দেখা যেত, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, আভিজাত্যে তারা নিখিলেশের থেকে অনেক হীন। ধ্বংসের গড়ানে পথে পা দিয়েই তারা জন্মেছে। নিখিলেশ যেন স্বেচ্ছায় শান্তির সমতল থেকে সরে এসে এই গড়ানে পথই বেছে নিল।

প্রায়ই নিখিলেশের খোঁজ পাওয়া যেত না এবং কিছুকাল সুরেশের কাজই হল কোন জুয়ার আড্ডা অথবা মদের চোরা আখড়া অথবা খাস বেশ্যাবাড়ী থেকে মাঝ রাত্রে তাকে তুলে আনা। কাজটা খুব প্রীতিকর ছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে অতি কুরুচিকর আবহাওয়ার মধ্যে অপেক্ষা করতে হত, যতক্ষণ না নিখিলেশের ঝোঁক মেটে অথব পকেটের শেষ কপর্দকটিও ফুরোয়। তারপর নিখিলেশ উঠে পড়ত। তার শরীর তখন টলটল করছে, গায়ের রং মলিন হয়েছে, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। সুরেশকে বলত, কিছু মনে কোর না বন্ধু, তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। সুরেশ সত্যই

কিছু মনে করত না অথবা হিতোপদেশও দিত না, শুধু তাকে ধরে ধরে বাড়ী নিয়ে যেত।

নিখিলেশের কাণ্ডগুলো যাই হোক, তার মূল ব্যক্তিসত্তার ওপর সুরেশের শ্রদ্ধা এতটুকুও কমেনি। সাধারণ থেকে উচ্চতর স্তরের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার তার যে প্রবণতা, নিখিলেশকে দিয়ে এখনও তা মিটত। নিখিলেশ সঙ্গীদের সঙ্গে সমভাবে হৈ-রৈ, হল্লা ও কেলেঙ্কারী করলেও সুরেশ সেই আড্ডায় গিয়ে পড়তে অন্যদের প্রতি ঘৃণার দৃষ্টিতে এবং বন্ধুর প্রতি সহজ প্রীতির দৃষ্টিতেই তাকাতো। সে মনে করত, নিখিলেশের চিন্তাধারায় জোট পাকিয়ে এই বিপত্তিটা হয়েছে। জোট খুললেই ঝোঁক কেটে যাবে।

কিন্তু একদিন একটু বাড়াবাড়ি হল। সেদিন নিখিলেশ রাত কাটাচ্ছিল কোলকাতার উপকণ্ঠে এক জুয়ার আড্ডায়। এই আড্ডায় ভারতবর্ষের বোধ করি, সকল দেশেরই প্রতিনিধি ছিল। পঞ্জাবী, সিন্ধী, কাবুলিওয়ালা এবং বাঙালীর সমান আনাগোনা ছিল এখানে।

সেদিন নিখিলেশ হারছিল। সচরাচর জুয়ার হার-জিতে তার সাম্য টলে না। কিন্তু পানের মাত্রা সেদিন অত্যধিক চড়া ছিল। সাতফুট লম্বা এক কাবুলিওয়ালার অশ্লীল বিদ্রূপে সেও কি একটা বিশ্রী জবাব দিল। কাবুলিওয়ালার হাতের মদের গ্লাসটা বেগে এসে লাগল নিখিলেশের কপালে।

তার কপালের দু'তিন জায়গা দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। সেদিকে খেয়াল করার মত অবস্থা ছিল না তার। এক মুহূর্ত সে ভয়ানক বিস্মিতের মত চুপ করে রইল। তারপর তার শরীরের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠলো। মুখে হিংস্র রেখা পরিস্ফুট হল। একজন পাগড়ি-খোলা শিখ প্রচুর মজার সম্ভাবনা দেখে হো-হো করে হেসে উঠল, তারপর নিখিলেশের হাতে নিজের কৃপাণটা এগিয়ে দিল।

কৃপাণটা ব্যবহার করবার সুযোগ পেলে ফল কি হত অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু ঠিক সেই নাটকীয় মুহূর্তে সুরেশ সেইখানে গিয়ে পড়ে। বরাবরের মত নিখিলেশকে খুঁজতে গিয়ে তাকে বাড়ীতে না পেয়ে আরও দু'একটা আড্ডা ঘুরে সুরেশ এইখানে এসে পড়েছিল। ঘরে ঢোকামাত্র নিখিলেশকে মাতাল অবস্থায় কৃপাণ হাতে দেখে সে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো। যে জীবন নিখিলেশ বেছে নিয়েছিল ইদানীং, তাতে এই ধরনের পরিণতি যে একদিন না একদিন অবশ্যম্ভাবী, এ অনুমান সুরেশের ছিল বোধকরি সেই কারণেই বর্তমান পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার মত খানিকটা প্রস্তুতিও তার মধ্যে ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে সে একটা প্রচণ্ড হৈ-চৈ ও ভর্ৎসনার রব তুলে জুয়াড়ীদের বিহ্বল করে দিল। তারপর তাড়াতাড়ি নিখিলেশকে টেনে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে তুলে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিল।

সমস্ত রাত্রি সুরেশের ঘুম হল না। একটা নারকীয় পরিস্থিতির মধ্য থেকে নিখিলেশকে তুলে আনতে সে উত্তেজনা হয়েছে, সেইটাই তার অনিদ্রার মুখ্য কারণ নয়। সে অত্যন্ত কোমলহৃদয় এবং হৃদয়ের সমস্ত কোমলতা দিয়ে সে নিখিলেশকে ভালবাসত। অনিদ্রার মধ্যে তার কেবলই এই চিন্তা উঠতে লাগলো, একে কেমন করে বাঁচানো যায়, ধ্বংসের পিচ্ছিল পথ থেকে বন্ধুকে কেমন করে উদ্ধার করা যায়। একটা উদার বিশ্বাসের বেদীমূলে যারা অবলীলায় নিজেদের জীবন বলি দেয়, ইতিহাস তাদের মহাপুরুষ বলে গণে, শ্রদ্ধার্ঘ্য দেয়, অমর করে ; কিন্তু এই যে একটা মানুষ—একটা নিন্দিত, হেয়, জনসমাজে অচল বিশ্বাসের অনুসরণ করে তিল তিল করে নিজেকে

ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, অপবাদের ভয় নেই, স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা নেই, জীবনের অকারণ ব্যর্থতায় এতটুকু খেদ নেই, এর অবিচলিত নিষ্ঠার কোন মূল্যই তো কেউ কোনদিন দেবে না! কিন্তু আশ্চর্য, পৃথিবীতে সারবান বস্তু এমন কি কিছুই নেই যার আকর্ষণ এই মানুষটার মনে বেঁচে থাকার ওপর তিলমাত্র দরদও এনে দিতে পারে?

একটা মহৎ উত্তেজনায় সুরেশ ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে লাগল। ঘর থেকে সে ছাদে বেরিয়ে এল। গ্রীষ্মের শেষ। শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ উঠেছে। আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই। অগণ্য নক্ষত্র অম্লান জ্যোতিতে ধিকধিক করে জ্বলছে। জ্যোৎস্নার পাতলা রূপালী কিরণ দৈব অভয়বাণীর মত বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। মহাশূন্যে এই সংখ্যাহীন জ্যোতিঃপুঞ্জ কোন্ সূত্রে বিধৃত রয়েছে? সুরেশ দার্শনিকতা নিয়ে মাথা ঘামাতো না। সেদিকে তার বুদ্ধির প্রবণতাই নয়। কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে শাশ্বত কিছু নেই বলে মধুরও কিছু নেই, সুন্দরও কিছু নেই—এ তার মন নিত না। কিন্তু নিখিলেশকে এ কথা সে কেমন করে বোঝাবে?

হঠাৎ একটা পরিকল্পনা তার মাথায় এল। অনুরাগ! এই, এই বিচিত্র সৃষ্টির যা কিছু সব পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে অনুরাগের সূত্রে,—জড় জড়ীয় অনুরাগে, চেতন চিন্ময় অনুরাগে। বুদ্ধির প্যাঁচে পড়ে নিখিলেশ এ যাবৎ পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই নেতি নেতি করে পরিত্যাগ করে এসেছে। কিন্তু গভীর অনুরাগের সামনা সামনি এসে সে কি কোনদিন পরখ করে দেখেছে, এ বস্তু ত্যাজ্য কি গ্রাহ্য?

নিখিলেশের মনে এই অনুরাগের বীজ উপ্ত করে দিতে পারে, এমন একজন মানুষকেই সুরেশ জানে। সে তার একমাত্র বোন শোভা। শোভার বয়স বছর একুশ। তখনও বিবাহ হয়নি।

সুরেশ নিজের মনের সামনে এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করল, নিখিলেশের সঙ্গে শোভার বিবাহ দিলে কেমন হয়। পায়চারী বন্ধ রেখে সুরেশ আবার ঘরে ফিরে শয্যায় শুয়ে চোখ বুঁজে প্রস্তাবটার পক্ষে এবং বিপক্ষে যত যুক্তি আছে বিচার করে নিল। রাত্রির নিবিড় স্তব্ধতা তার বিচারকে সম্পূর্ণ করে মীমাংসায় আসতে সহায়তা করল।

অবশ্য বিপদের আশঙ্কা অনেক। যদি শোভার সংস্পর্শে এসেও নিখিলেশ সুস্থ জীবনযাত্রায় না ফিরে আসে, তাহলে শোভার জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু এও ঠিক যে, নিখিলেশের পরিবর্তনের সম্ভাবনাই সর্বাধিক। শোভা খুব ফর্সা নয়, খুব সুন্দরীও নয়। কিন্তু সুরেশ তো জানে বাহ্যরূপ নিখিলেশকে দূরেই সরায়, কাছে টানে না। কিন্তু শোভার চোখে মুখে ত্বকে, দাঁড়ানোয়, চলায়, কথা বলার সুস্থির ভঙ্গিমায় একটা আশ্চর্য মানস রূপের আভাব ছিল। শোভার সঙ্গে একটুখানি দাঁড়িয়ে কথা বললেই তার এই সূক্ষ্ম রূপ চোখের পাহারা এড়িয়ে মনের দরজায় কড়া নাড়ে। যে মাধুর্য এবং মানুষের প্রতি দরদ সুরেশের প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট্য মাত্র। ভগবান যেন শোভার সমস্ত সত্তাটাকেই কেবল সেই উপাদানে তৈরী করেছেন। শোভাকে পেলে নিখিলেশ যদি না ফেরে, সে জাহান্নমে যাক্, কিন্তু মানুষকে ভালবাসার যে আশ্চর্য ক্ষমতা দিয়ে ভগবান শোভাকে পাঠিয়েছেন, তাকে এমন একটা মহৎ সাধনায় নিয়োগ করার সুযোগ পেয়েও ভয়ে পিছিয়ে যাবে, এত নিচু থাকের মানুষ সুরেশ নয়।

সংকল্পটা মনে মনে পাকিয়ে নিয়ে সুরেশ বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করল। নিজের প্রকৃতির অভাব সে বোঝে। তার তেজ নেই, নিষ্ঠা নেই, সাহস নেই এবং ঠিক সেই কারণেই সে নিখিলেশকে এত শ্রদ্ধা করে। কিন্তু আজকের এই সংকল্পে সে মনে মনে গর্ব বোধ করল

এই ভেবে যে, প্রয়োজন হলে ব্যক্তিত্বের উচ্চতায় সেও নিখিলেশের সমপর্যায়ে যেতে পারে।

পরের দিন সকালে সুরেশ যখন নিখিলেশের বাড়ীতে পৌঁছুলো, সে তখন বিছানা ছেড়েছে, স্নান করেনি, কিন্তু মাথা স্থির। এলিয়ে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল, সুরেশকে দেখেই বললে, এস এস, তুমিই আমার ত্রাণকর্তা !

সুরেশের মাথায় তখন সংকল্পিত প্রস্তাব গজ গজ করছে। একেবারে সোজা জবাব দিল, হ্যাঁ, ত্রাণ করতেই এসেছি। কিন্তু যে উদ্ধার হবে, তার নিজের আগ্রহ থাকা চাই।

নিখিলেশ বললে, কি রকম ? কালকের কেলেঙ্কারী কি শেষে ফাঁড়ি অবধি গড়িয়েছে নাকি ? আমার কিন্তু কিছু মনে নেই।

সুরেশ একটু ঘোরাল, একটু অন্য কথা বলল, তারপর নিখিলেশকে ঈষৎ প্রস্তুত করে নিয়ে একেবারে শোভার সঙ্গে তার বিয়ের কথা পেড়ে বসল।

নিখিলেশ প্রস্তাব শুনে একেবারে দু' চোখ কপালে তুলল। বললে, এটা কি ? তুমি রসিকতা করছ নাকি ? আমি একটা লোচ্চা বদমায়েস লোক. মেয়ে-মদ্দার জোড়া দেওয়াকে আমি একটা পবিত্র সংস্কার বলে ভাবতেই পারি না। আমার সঙ্গে তোমার বোনের বিয়ে দেবে কেন ?

সুরেশ কণ্ঠস্বরে গুরুত্ব আরোপ করে বললে, কেন'র কৈফিয়ত আমি শোভাকে দেব, আর নিজের বিবেককে দেব। আমাকে কেবল তোমার মীমাংসাটা জানিয়ে দাও।

নিখিলেশ ভাববার জন্য একদিন সময় নিল। আরও কিছুক্ষণ নানা অবান্তর বিষয়ে আলোচনা করে সুরেশ উঠে পড়ল।

সুরেশের দিক থেকে তাকে উদ্ধার করার আন্তরিক চেষ্টা দেখে

নিখিলেশ প্রচুর কৌতুক বোধ করল। ভাবল, সুরেশের ওপর সাক্ষাৎ যীশু ভর করেছে দেখছি। কিন্তু প্রস্তাবটাকে উড়িয়ে দিল না। আসল কথা, সমাজের নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে অহর্নিশ একটানা উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে দিন কাটাতেও তার আর ভাল লাগছিল না। আর কিছু নয়, অপরিসীম একঘেঁয়ে মনে হচ্ছিল। অথচ, সমাজের গেরস্ত ভদ্রলোকদের মত দিন কাটাবার কথা ভাবতেও তার মাথা ঝন ঝন করে।—ঘানিটানা বলদ! শোভাকে সে খুব বেশী না চিনলেও চেনে। বিয়ে করলে অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও একঘেয়েমি ঘুচবে। তারপর ভাল না লাগে, শোভার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে দাম্পত্য সম্পর্ক বরবাদ করে দিলেই হল। শোভা দুঃখ পাবে? পেলেই বা। তিন দিনের জীবন, একদিন সুখ, একদিন দুঃখ, একদিন যেমন তেমন,—গড়পড়তায় এ ছাড়া তো আর অন্য কিছু হতেই পারে না, সে নিখিলেশই শোভার স্বামী হোক অথবা হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় বা অন্য নামধারী জনৈক মহাশয় ব্যক্তিই হোন।

সুরেশকে ভবিষ্যৎ বিপদ সম্বন্ধে ভদ্র সতর্কবাণী জানানো সত্ত্বেও সে যখন জিদ করতে লাগল, নিখিলেশ সম্মতি দিল। ভাগ্যক্রমে পক্ষই ব্রাহ্মণ, গোত্রেও গোল ছিল না। একদিন রাঙা হরফে নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে নিখিলেশ শোভাকে বিয়ে করে আনল। পরিহাসটা নিজের কাছে বেশ কড়া করে জমাবার জন্য সে সম্প্রদানের সময় সংস্কৃত মন্ত্রগুলো অতি বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করল।

নিখিলেশের সঙ্গে শোভার পূর্ব পরিচয় ছিল এ কথা বলেছি, পূর্বরাগ ছিল বলিনি, কারণ তা ছিল না, যদিও জানি, ওদের মধ্যে

পূর্বরাগের অরুণাঞ্জন আমার গল্পে একটু ছুঁইয়ে দিতে পারলে আপনাদের মধ্যে যারা ঢুলছেন, তাঁদের ঘুম ছেড়ে যেত, যারা অর্ধেক মনোযোগ দিয়ে শুনছেন, তারা কৌতূহলে সজাগ হয়ে উঠতেন। তরুণের কাছে রোমান্সের আবেদন চিরন্তন। কিন্তু গল্প হলেই তার মধ্যে রোমান্স থাকবে, গল্পের এই সংকীর্ণ সংজ্ঞায় আপনারা আস্থা রাখবেন না। প্রেম, ভালবাসা, পূর্বরাগ, অনুরাগ এ সব আবেগ আরও শতলক্ষ আবেগের সঙ্গে মিশেল হয়ে জীবনের অফুরন্ত পট্টবস্ত্রে একসাথে ঠাসবুনেন হয়ে আছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রও জীবনের মত অফুরন্ত। শৃঙ্গারের মতিমহল যতই সুরভিত হোক, সাহিত্যকে যারা কেবল তার মধ্যেই আবদ্ধ দেখতে চান, আমি বলব, তারা একধরণের অসুস্থ রস-বোধের পরিচয় দেন। এমন রসিক যদি বৃদ্ধ হন, তাঁর চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত; যদি তরুণ হন, তার সংযম অভ্যাস করা উচিত।

অবশ্য এ কথা আমার নিজেরও মনে হয়েছিল যে, প্রস্তাব শোনামাত্র নিখিলেশ যখন শোভাকে বিয়ে করতে রাজী হল, এবং তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার সংবাদ জেনেও শোভা যখন তাতে অসম্মতি জানাল না, তখন ওদের মধ্যে শুধু মুখের আলাপই ছিল না, পারস্পরিক আসক্তিও যথেষ্ট ছিল সুরেশ বড় ভাই, ভগ্নী সম্বন্ধে এ-বিষয়ে আলোচনা করতে তার সঙ্কোচ স্বাভাবিক জেনে আমি তাকে পরোক্ষে নানা প্রশ্ন করেছিলাম এবং সন্দেহ নিরসনের জন্য একদিন, এমন কি, সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নিখিলেশ এবং শোভার মধ্যে ভালবাসা ছিল কি না। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে পারে সুরেশের জবাবে আমি এমন কোন উপাদান পাইনি।

সুরেশ ম্লান হেসে জবাব দিয়েছিল, না, নিখিলেশ শোভাকে ভালবাসত না। নাস্তিকতার অনুশীলনে সমস্ত বস্তুর মধ্যে যে সকল

সময় বস্তুর অতীত এক অনন্তগহ্বর শূন্য দেখছে, তার মধ্যে ভালবাসা জন্মাবে কেমন করে ?

সুরেশের ব্যাখ্যা কিন্তু আমার মনে ধরেনি। আগাগোড়া কাহিনী শুনে বরং আমার এই কথাই মনে হয়েছিল যে, বয়স তখন তেইশ চব্বিশ হলেও এবং বুদ্ধির অনুশীলনে পরম পাকা হলেও আসলে নিখিলেশ মনে মনে তখনও শিশু ছিল। যুক্তিতর্কের একপেশে চর্চার ফলে তার হৃদয় তখনও প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি। যে চোখে নারীকে দেখলে ভালবাসা আসে, সে চোখ তখনও তার তৈরী হয়নি।

সে যাই হোক, ওদের ভালবাসার মুখরোচক খবর না শোনাতে পারলেও বিবাহের পূর্বে ওরা পরস্পরের যেটুকু কাছাকাছি এসেছিল, সেই সান্নিধ্যের একটা ভাসা-ভাসা ছবি আমি সুরেশের কথা থেকে পেয়েছিলাম। এখন বলতে বলতে আশা করি আপনাদের কাছে আমি সেই ছবিটুকু ধরে দিতে পারব।

সুরেশের সংসারে তখন সে, শোভা আর ওদের মা কল্যাণী। সুরেশের বাবা ওর বালক বয়সেই মারা যান। ভদ্রলোক ইনকম-ট্যাক্সের বড় অফিসার ছিলেন। ঘুষ নিতেন না, কিন্তু কেবল মিত-ব্যয়িতার গুণে মোটা অঙ্কের কোম্পানীর কাগজ রেখে গিয়েছিলেন। তার সুদেই ওদের সংসার চলত।

কলকাতার উত্তরপ্রান্তে ওরা একটা ছোট বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকত। একতলাটা সাব-লেট করা। দোতলার বড় ঘরে শোভা আর কল্যাণী থাকতেন, আর সংসারের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা হত সেই ঘর থেকে। তিনতলার নিরিবিলি উত্তর-দক্ষিণ খোলা লম্বা ঘরে সুরেশ নিজে থাকত একা। ঘরের সামনে খানিকটা ছাদ। কলেজ-ফেরত নিখিলেশ এলে সেই ছাদের ওপর বেতের চেয়ার পেতে বসে সামনের প্রকাণ্ড পার্কের কিনারে কিনারে সমব্যবধানে সাজানো

বিলাতি পামগাছগুলোর মাথায় মাথায় অপরাহ্ণের রঙ-নামা দেখতে দেখতে আর ফাঁকে ফাঁকে অনেক দূরে কারখানার আকাশ ছোঁয়া নলগুলোকে দৃষ্টির সীমায় রেখে ওদের দুজনের বাক্যালাপের কল খুলে যেত। মাঝে মাঝে শোভা এসে চা এবং চিবিয়ে সুখ এমন টুকিটাকি কিছু খাবার রেখে যেত। অনেক রাত্রি হলে কল্যাণী এসে সস্নেহ তিরস্কারে নিখিলেশকে বাড়ীর কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

কলেজে সুরেশের সঙ্গে আলাপ ঘন হবার পর থেকেই তার বাড়ীতে নিখিলেশের আনাগোনা, যেমন নিখিলেশের বাড়ীও সুরেশের কাছে অবারিত ছিল। প্রথম প্রথম শোভা ওদের আড্ডায় আসত না, কল্যাণী নিজেই যেতেন। তাঁর বয়স তখন চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। দীর্ঘ বৈধব্যের দাহে তাঁর দেহ তখন শুদ্ধ সোনার মত জ্বলজ্বলে ও শান্ত। দিনরাত্রির অধিকাংশ সময় পূজাপাঠ নিয়েই থাকতেন। কিছুদিন নিখিলেশকে দেখে, তার কাছাকাছি এসে এবং কিছু কিছু আলাপ করেই তিনি বুঝতে পারলেন, সুরেশের বন্ধুর প্রাণ বড়, ঘনিষ্ঠতা পেলে সে তার অমর্যাদা করবে না। তারপর থেকে নিশ্চিন্তচিত্তে শোভার ওপর নিখিলেশের আতিথেয়তার ভার দিয়ে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিলেন।

আমি সুরেশকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শোভাকে সে নিখিলেশের কাছে আধুনিক ধরনে ইনট্রোডিউস করে দিয়েছিল, না ধীরে ধীরে তাদের পরিচয় আপনা থেকেই পেকে উঠেছিল। সুরেশবাবু বেশ জোর দিয়েই বলেছিলেন, পরিচয় পেকে ওঠা দূরের কথা, ওদের মধ্যে সত্যকার কোন পরিচয় ঘটেছিল বলে তিনি মনে করেন না। মাঝে মধ্যে এক-আধটু মুখের আলাপকে যথার্থ পরিচয় বলে না। সুরেশের ধারণা বিবাহের পূর্বে শোভা কেমন মেয়ে নিখিলেশ তা বোঝেনি এবং নিখিলেশের ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি সম্বন্ধেও কোন স্পষ্ট বোধ শোভার

ছিল না। তার উক্তির সমর্থনে সে ওদের পরিচয়কালীন কয়েকটা ঘটনারও উল্লেখ করেছিল। কিন্তু সে সব ঘটনা শুনে আমি সুরেশের সঙ্গে একমত হতে পারিনি। সুরেশ সুন্দর মানুষ, কিন্তু তার কল্পনা খুব দূরপ্রসারী ছিল, এমন ধারণা আমার হয়নি। অতল সমুদ্রের মত রহস্যময় মানুষের মনে কোন ঘটনা কি দাগ রেখে যায়, সে সম্বন্ধে আমি সুরেশের মত নিশ্চিত নয়। যে সব ঘটনা থেকে সে শোভা ও নিখিলেশের মধ্যে কোন প্রাক-বৈবাহিক আসক্তি ছিল না বলে নিঃসন্দেহ হয়েছিল, সেই সব ঘটনারই চোরা স্মৃতি যে ভবিষ্যতে ওদের বিবাহে পারস্পরিক সম্মতিদানের ওপর কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করেনি, এমন কথা আমি ততখানি দৃঢ়ভাবে বলতে সাহস করি না।

সুরেশ আর নিখিলেশের কথার মাঝখানে শোভা যখন আসত চায়ের পেয়ালা এবং গরম সিঙ্গাড়া কিম্বা ডালের বড়া কিম্বা চানাচুরের প্যাকেট প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে, নিখিলেশ প্রথম প্রথম ওর দিকে মোটে তাকাতোই না। নিজের চিন্তার আর যুক্তির জটাজাল তার বর্হিদৃষ্টির সম্মুখে এমনই দুর্ভেদ্য অন্তরাল সৃষ্টি করত যে, শোভা কেন, চোখের সামনে উর্বশী কি মেনকা, তিলোত্তমা কি রম্ভা এসে মুনিদের মনোহারী স্বর্গলোকের সবচেয়ে প্রিয় নৃত্যটি শুরু করলেও তার মানস অভিনিবেশের কাঁটা অন্তর থেকে বাইরে ঘুরে দাঁড়াতো না। সুরেশও শোভাকে বিদেশী কায়দায় ইনট্রোডিউস করে দেয়নি। ওসব ফাঁপা আধুনিকতার রেওয়াজ ওদের পরিবারে কোনদিনই ছিল না।

ওদের বাক্যালাপ যেদিন শুরু হল, সেদিন বর্ষাকাল। এত বৃষ্টি যে, আকাশকে একটা শূন্যে অবস্থিত আদিঅন্তহীন জলাশয় বলে মনে হয়। শনিবার, সকাল সকাল ফেরার কথা, কিন্তু এমনও অনেকদিন হয় যে, ওরা সরাসরি সুরেশের ওখানে না এসে নিখিলেশের বাড়িতে

উঠল, কিম্বা অন্য কোথাও ঘুরল,—ফিরল অনেক রাত্রে। তবু বোধকরি বৃষ্টি খুব বেশী হচ্ছিল বলেই কল্যাণী উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে পারলেন না। শোভাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এত জল ঝড়, সুরেশ এখনও বাড়ি এল না, কোথাও যাবে কিছু বলে গিয়েছিল ?

শোভা কাছেই বসে কালো সুতো দিয়ে একটা লম্বা পটে শিবমূর্তি বুনছিল। তার হাত যেভাবে চলছিল, বোনার কাজে তেমন মনোযোগ আছে বলে বোধ হচ্ছিল না। হয়তো অঝোর বর্ষার একটানা ঝম ঝম শব্দ তার কৈশোরের নানা সুখদুঃখের অলস স্মৃতি জাগিয়ে তার অভিনিবেশকে ব্যাহত করছিল। বললে, কই না, কিন্তু ভাববার কিছু নেই মা, দাদা বর্ষাতি নিয়ে বেরিয়েছে।

নিশ্চিন্ত হবার জন্য কল্যাণী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুই ঠিক দেখেছিলি ?

শোভা ঘাড় নেড়ে নিজের উক্তির সমর্থন করল।

ছেলের কাছে বর্ষাতি আছে—মা নিশ্চিন্ত হলেন, কিন্তু শোভার মনে আর একটা যে উৎকণ্ঠা উঁকি মারছিল, তার কথা সে মাকে জানালো না। সুরেশের কাছে বর্ষাতি আছে বটে, কিন্তু বর্ষা শুরু হওয়া থেকে যতদিন সে নিখিলেশকে আসতে দেখেছে, তার কাছে কখনও বর্ষাতি দেখেনি, ছাতাও দেখেনি। এই বাদলার মধ্যে যদি সে পড়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসহায় হয়ে ভেজা ছাড়া তার উপায় থাকবে না। এবং এতখানি ভিজলে পরে যে কতরকম অসুখ হতে পারে, সেই ভয়াবহ কল্পনায় তার মন মায়ায় বেদনায় ভারাতুর হয়ে উঠল।

একটু পরেই ওরা ফিরল। বর্ষার প্রাবল্য তখনও কিছুমাত্র কমেনি। কড়া নাড়ার শব্দ হতেই শোভা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখে, সে যা আশঙ্কা করেছিল তাই ঘটেছে। দুই বন্ধু একসঙ্গেই ফিরেছে। সুরেশের গায়ে বর্ষাতি, মাথায় ওয়াটার প্রুফ টুপি নেই,

কিন্তু রুমালটা এমন যত্ন করে সমস্ত মাথাটা ঢেকে বাঁধা যে, ভিজলেও জল মাথায় বসবে না। আর নিখিলেশ এত ভিজেছে যে, তার পাঞ্জাবি, গেঞ্জি আর ধুতি সপসপিয়ে গায়ের সঙ্গে সেঁটে গিয়ে গায়ের তামাটে রঙের আভা দেখা যাচ্ছে। বড় বড় ঘন চুলে ভরা মাথা থেকে টপ টপ করে জল গড়িয়ে চোখের পাতায় নাকের আগায় পড়ছে, তুই গাল বেয়ে ঝরে পাঞ্জাবির বোতামে জলবিন্দুগুলো একটু-খানি দাঁড়িয়ে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। নিখিলেশের ধোয়া মুখ কিন্তু অনাবিল হাসির আভায় উজ্জ্বল।

কল্যাণী বেরিয়ে এলেন। শোভাকে বললেন, একখানা শুকনো কাপড় আর গেঞ্জি বাথরুমে এখনই দিয়ে এস, নিখিলেশ পরবে।

নিখিলেশ বাথরুমে গেলে কল্যাণী সুরেশকে তিরস্কার করে বললেন, এতবড় স্বার্থপর তুই কবে থেকে হলি ? এই আকাশ-ভাঙা জলের মধ্যে বন্ধুকে নিয়ে এলি, সে ভিজে স্নান হয়ে গেল আর তুই বর্ষাতি নিয়ে তারই পাশাপাশি দিব্যি শুকনো গায়ে এলি ? ওই বর্ষাতিটাই তো তুজনে ভাগাভাগি করে গায়ে দিতে পারতিস্ !

সুরেশ বর্ষাতিটা খুলে যত্ন করে আলনার তুলে রেখে কৌতুকভরা দৃষ্টিতে মার দিকে তাকালো। বললে, এই কথাই তুমি বিশ্বাস করলে মা ? তারপর বাথরুম থেকে নিখিলেশ শুনতে না পায় এমন ভাবে স্বর গভীর আর নিচু করে বললে, নিখিলেশ এক অদ্ভুত ছেলে মা! আমরা তো ওর বাড়িতেই বসেছিলাম। বৃষ্টি যখন খুব জোরে নামল, ও হঠাৎ গেঞ্জি আর পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে আমাকে বললে, চল আমরা বেরিয়ে পড়ি। আমি জানতাম বৃষ্টিতে ভিজতে ও ভালবাসে। কিন্তু তাই বলে বৃষ্টির ধারা যখন তীক্ষ্ণ হয়ে বাণের মত পৃথিবীতে নামছে, তখনও কেবল জলে ভেজবার জন্যই ও বেরুতে চাইবে, এ আমি ভাবতে পারিনি। কিছুতেই মানা শুনলে না।

অগত্যা আমাকেও ওয়াটারপ্রুফ চাপিয়ে ওর সঙ্গে বেরুতেই হল। বাসে উঠে আমরা গেলাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। তারপর সেই অসম্ভব বৃষ্টির মধ্যে আমরা সেই স্মৃতিসৌধের চারপাশে ঘুরে ঘুরে বস্তুটার শিল্পমাধুর্য উপভোগ করতে লাগলাম। আমি যত বিরক্ত হয়ে বলি, ফিরে চল, ও কেবলই আমার হাত ধরে বলে, আর একটু দাঁড়াও। ঘণ্টা দেড়েক এইভাবে জলে ভিজে আমরা এই ফিরলাম।

কল্যাণী এবং শোভা অবাক হয়ে শুনছিল। কল্যাণী বললেন, আশ্চর্য ছেলে তো! ওর বাড়ীতে কিছু বলে না?

সুরেশ বললে, বললেই বা শুনছে কে? তা ছাড়া ওর বাবার শাসন খুব কঠোর নয়। এক জ্যাঠামহাশয় ছিলেন, তাকে খুব ভয় করত, তিনি মারা গেছেন।

একটু পরে নিখিলেশ বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। গা মাথা মুছে চুল আঁচড়ে শোভার দেওয়া ধুতিখানা পরে বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু গেঞ্জি গায়ে দেয়নি। নিখিলেশের দীর্ঘ গৌর সন্তমার্জিত অনাবৃত দেহের দিকে ওরা তিনজনেই সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

কল্যাণী বললেন, শুধু গা কেন? শোভা বুঝি গেঞ্জি দিসনি?

শোভা তখনি বাথরুম থেকে গেঞ্জিটা নিয়ে এসে নিখিলেশের দিকে এগিয়ে দিল।

নিখিলেশ ঈষৎ হেসে বললে, কিন্তু স্নান করে গেঞ্জি গায়ে দেওয়া আমার অভ্যাস নয়।

শোভা বোধকরি আর থাকতে পারল না। আজকের ঘটনায় দাদার এই অসাধারণ-প্রকৃতি বন্ধুর সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে তার আর কোন সঙ্কোচ রইলো না। বললে, তা হোক, অনেক ভিজেছেন, আর মা বলছেন, গেঞ্জিটা গায়ে দিন।

নিখিলেশ শোভার হাত থেকে গেঞ্জিটা নিয়ে নিজের হাতেই রেখে সুরেশের সঙ্গে উপরে উঠে গেল।

একটু পরে মার উপদেশ মত প্রচুর পরিমাণে আদা-রস মিশিয়ে সে দু'কাপ চা নিয়ে উপরে উঠে গেল।

ওদের কথার মাঝখানেই টেবিলে চায়ের পেয়ালা রেখে শোভা নিখিলেশকে উদ্দেশ করে বললে, একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন, চা বোধহয় তেমন গরম নেই।

শোভার বলার মধ্যে তাগিদ ছিল। নিখিলেশ কথা থামিয়ে শোভার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে একবার তাকালো। তার চিত্তের দোরে আবেদন পৌঁছে দিতে পারে এমন কিছু বোধ করি শোভার মুখে পেল না। চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বলতে পারি না, বরং আদার রসটাই গরম হয়ে উঠেছে।

শোভা ঈষৎ অপ্রতিভ হল। বললে, আদার রস একটু বেশী দিয়ে ফেলেছি। আর এক পেয়ালা শুধু চা এনে দেব?

নিখিলেশ আর এক চুমুকে পেয়ালা শেষ করে বললে, আমার আপত্তি নেই।

চা সত্যিই গরম ছিল না, সুরেশের পিয়ালাও শেষ হয়েছে। কাপ-ডিসগুলো হাতে নিয়ে শোভা ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে হল, ঘুরে দাঁড়িয়ে নিখিলেশের দিকে চেয়ে সহজ স্বরে বললে, আমাকে "আপনি" বলছেন কেন নিখিলেশদা? তুমি বলবেন, না হলে সঙ্কোচ লাগে।

নিখিলেশ একটু আশ্চর্য হল। আবার মুখ তুলে সে শোভার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালো। জানালা দিয়ে মেঘঢাকা আকাশের অপরাহ্নের যে একটুখানি আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে, তার আভায় শোভার মুখখানা ভাল করে দেখা যায় কি না যায়। তার

পরণে একটা সাদা শাড়ী, পাড়টা বেগুনী ফুলে ভরা। ওর বয়সের মেয়েরা সাধারণত সাদা শাড়ী না পরলেও শোভা রঙীন শাড়ী পছন্দ করে না। বড় বড় চোখ দুটো সরল, ভাসা-ভাসা, পূর্ণ সরোবরের জলের মত কালো, কোণ থেকে কোণ অবধি টলটল করছে। কিন্তু নিখিলেশের দৃষ্টিতে শোভার চেহারার মধ্যে এবারও কোন বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ল না। বুদ্ধির যে তীক্ষ্ণাগ্র দৃষ্টি নিখিলেশ চেনে আর ভালবাসে, শোভার তা নেই। চোখ সরিয়ে সুরেশের মুখের ওপর রেখে নিখিলেশ জিজ্ঞাসা করলে, কেন ?

শোভা নিশ্চয়ই আশা করেনি, তার এই সামান্য অনুরোধের উত্তরে নিখিলেশ কোন প্রশ্ন তুলবে। লজ্জিত পাংশু মুখে সেও সুরেশের দিকে ফিরে তাকালো।

সুরেশও নিখিলেশের প্রশ্নে আশ্চর্য হল। বললে, কেন কি ? তুমি বয়সে বড়, আমার বন্ধু, "তুমি"-ই তো বলবে।

তাতে আপত্তি নেই, নিখিলেশ সুরেশের দিকে চেয়েই জবাব দিল, কিন্তু দাদা কেন ? আমি তো শোভার দাদা নয়, ওর দাদা তুমি। আমি তোমার বন্ধু। আমাকে দাদা বললে বাংলা ভাষার নির্ভুল ব্যবহার হল মনে করি কি করে ?

শোভা কাপ-ডিসগুলো হাতে নিয়ে সেই ভাবেই দাঁড়িয়েছিল। নিখিলেশের জবাব শুনে তার মুখের বিবর্ণতা কেটে গিয়ে সহজ রং ফিরল। একটা সামান্য বিষয় নিয়ে নিখিলেশ তাকে অকারণ অপমান করছে না, এইটুকু বুঝলো, যদিও বাংলা ভাষার সুপ্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ নিয়ে নিখিলেশ কি বলল সে সম্বন্ধে তার আগ্রহ ছিল না।

সুরেশ বললে, দাদার বন্ধুকে দাদা বলবে এইটাই রেওয়াজ, শিষ্টাচারও বটে। এতে তোমার আপত্তিই বা কিসের ?

কিছুই না, নিখিলেশ মন্তব্য করল, যদি না নির্জলা মিথ্যাকে তোমরা শিষ্টাচার বলে চালাতে চাইতে। ভাই বোন একটা পারিবারিক সম্পর্ক। শোভার সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক নেই। আমাকে সে দাদা বললে আমার সঙ্গে এই সম্পর্কের অভাব সূচিত হয় না, অস্তিত্বই বোঝানো হয়। শিষ্টাচারের অজুহাতে এই মিথ্যাকে সমর্থন করি কি করে?

নিখিলেশের চিন্তা ও ভাবের তল পায় না সুরেশ। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তার সংজ্ঞার প্রতিবাদের মর্মও সে নিতে পারল না। ক্ষুব্ধস্বরে বললে, কি জানি। আমায় বাবার বন্ধুর নাম যদি রমেশ হয়, হাজার সত্যের খাতিরেও আমি তাঁকে রমেশবাবু বলে ডাকতে পারব না। রমেশকাকাই বলব।

তার কারণ, নিখিলেশ ব্যাখ্যা করল, তুমি সেই শিক্ষাই পেয়েছ, সেইটাই অভ্যাস করেছ। সেই পিতৃবন্ধুকে রমেশকাকা না বলে ছেলেবেলা থেকে যদি তাঁকে রমেশরায় বলে ডাকতে শেখানো হত, তাহলে বড় হয়ে তাঁকেই রমেশবাবু বলে না ডাকলে তোমার মন ভরে খুঁতখুঁতুনি উঠতো। ওটা কোন কথাই নয়। কথা হচ্ছে, সেই শিক্ষাই বা দেব কেন? সত্যের শুচিকে বর্জন করে শিষ্টাচারের চুনকামকে জীবনে বড় করব কেন?

চোখ বুঁজে আর একটু ভেবে নিয়ে নিখিলেশ বলে চলল, আসল কথা কি জান? মানুষের সভ্যতার চেষ্টাটাই হয়েছে উলটো পথে। যা সহজ, যা সত্য, যা অকপট, তাকে বর্জন করে যা সুবিধাজনক, যা মানান-সই, যার জাঁকজমক আছে, আমরা সমাজ-জীবনে তাকেই বরণ করে এসেছি। তা না-হলে আমরা গাছের পাতা ছেড়ে তুলো আর রেশমের কাপড় দিয়ে আমাদের শরীর ঢাকতাম না, বাঁশ আর লতাপাতার ছাউনি ছেড়ে লোহার শিক আর খোয়া দিয়ে সিমেন্ট

কংক্রিট করা প্রাসাদকে আমাদের বাসস্থান করতাম না। জন্মমৃত্যুর রহস্য আর এই বিরাট প্রপঞ্চের উৎপত্তি এবং পরিণতি কোথায়, এ সব চিন্তায় নিরত না থেকে আমরণ নিজের ও দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় আয়ু অপচয় করতাম না।

নিখিলেশের অর্ধ-নিমীলিত চোখ আর সমাহিতভঙ্গী থেকে তার আন্তরিকতা সম্বন্ধে সংশয় করার কিছু ছিল না। সুরেশ বেশ একটু কৌতুক বোধ করল। হেসে বললে, তোমার চিন্তাধারা তোমাকে এক এক সময় কোন্ খানা-ডোবায় নিয়ে গিয়ে ফেলে, তুমি টের পাও না। তুমি কি চাও আমরা সেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মত বাঁশ আর লতাপাতার ছাউনিতে থেকে কোমরে বল্কল এঁটে তীর-ধনুক হাতে হরিণ শিকার করে বেড়াব?

নিখিলেশ তেমনি আধবোঁজা চোখেই জবাব দিল, চাই বই কি? জীবনযাত্রাকে যতদূর সম্ভব স্বভাবের অনুগামী রেখে গোটা মানুষ জাতিই জীবন ও মৃত্যুর রহস্য সমাধানে উঠে পড়ে লেগে যাক, এইটাই চাই। কিন্তু চাইলেই কি পাওয় যায়? গোটা সভ্যতাটাই লাটাইয়ে উল্টোপাকে সুতো জড়ানোর ইতিহাস। সে সমস্ত খুলে আবার সোজা-পাকে সুতো জড়ানো, এ কি কেবল আমার একার চেষ্টাতেই হয়?

সুরেশ এ কথার আর জবাব দিল না। নিখিলেশ চেয়ারে এলানো শরীরটাকে সোজা করে নিয়ে বসে একবার সুরেশের দিকে একবার শোভার দিকে চেয়ে দেখল। শোভা তখনও কাপ-ডিস হাতে স্থাণুর মত দাঁড়িয়েছিল। বোধকরি অভদ্রতা হবে বলে সরে যেতে পারছিল না। একটা সামান্য বিষয় নিয়ে নিখিলেশের এতখানি যুক্তি তর্কের অবতারণার মধ্যে সে কোন সার পেল না। কিন্তু তার চোখের মধ্যে এমন একটা অসহায় অস্থিরতা শোভার নজরে পড়ল যে, সহানুভূতিতে তার মন গলে গেল।

নিখিলেশ বললে, কই, আর এক পেয়ালা গরম চা নিয়ে এলে না তো ?

শোভা সপ্রতিভভাবে বললে, আনছি। কিন্তু আপনি যাই বলুন, আমি আপনাকে নিখিলেশদা বলেই ডাকবো।

নিখিলেশ হেসে উঠল, বললে, সাড়া দেব না।

সাড়া ঠিকই দেবেন, শোভা বললে, ডাকলে সাড়া আপনি আসে। মনে মনে এত কূটতর্কের বুলি আউড়ে নেবার সময় পাবেন না।

সেইদিন থেকেই শোভার সঙ্গে নিখিলেশের বাক-বিনিময় শুরু হল বটে, কিন্তু ওদের পরিচয় যে তাতে কিছু ঘনতর হয়ে উঠল, এমন নয়। বস্তুত, নিখিলেশের শোভার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজনও হত না, কোন তাগিদও ছিল না। হয়তো কখনও সুরেশের সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটা বই দেখার প্রয়োজন হল, শোভা ঘরে আছে, নিখিলেশ শোভাকে বললে, র‍্যাক থেকে বইটা পেড়ে দিতে, শোভা বই পেড়ে নিখিলেশের হাতে তুলে দিল, কিম্বা, হয়তো প্রথম দেখায় বইটা খুঁজে পেল না, নিখিলেশ নির্দেশ দিলে, ওটায় কেন, ওর তলার র‍্যাকে বাঁ দিকে, শোভা তখন ঠিক বইটি এনে নিখিলেশের হাতে দিল ; হয়তো সুরেশ একটু উঠে কোথায় গেছে, পশ্চিমের জানালা দিয়ে ঘরে রোদ আসছে, শোভা এসে পড়েছে ঘরে, নিখিলেশকে জিজ্ঞাসা করলে, এত গরমে রোদ আপনার ভাল লাগছে ? নিখিলেশ বললে, একটুও না, কেবল আলসেমির জন্য সরে বসছি না। শোভা জানালার যে পাল্লাটা যতটুকু বন্ধ করলে নিখিলেশের গায়ে রোদ না পড়ে, সেই পাল্লাটা ততটুকু বন্ধ করে চলে যায়।

বিকালে স্নান করে উঠে শোভা ছাদে আসত কাপড় শুকুতে

দিতে। নিখিলেশ ঘরে থাকলে এক একদিন সেদিকে তার দৃষ্টি যেত। নিখিলেশ মুগ্ধ হত। স্নান করে এলে শোভাকে কি সুন্দর দেখায়! অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গঠন-সৌষ্ঠবের সৌন্দর্যে নয়, পরিপূর্ণতার একটা অপরূপ শ্রী। ফুলে পাতায় ভরা বর্ষাস্নাত একটা শিউলিগাছের মত স্বভাব-সুন্দর। ভিজে কাপড়গুলো নিয়ে একটা একটা করে শোভা তারের ওপর শুকুতে দিত। তার পিঠ থাকত নিখিলেশের দিকে, সাদা শাড়ীর ওপর এলিয়ে দেওয়া ভিজে চুলের রাশ কটি অবধি ঝুলে পড়ত। কাপড়গুলো তারে মেলে দেবার সময় হাত দুটো উঠত নামত, কিনারগুলো ছড়িয়ে দেবার জন্যে আঙুলগুলো খেলত, কানের দুল দুটো ঈষৎ দুলতো, পা দুটো উঠা-নামার সময় শাড়ীর তল থেকে খানিক মুছে-যাওয়া আলতার রেখা একবার দেখা যেত, একবার পাড়ের নিচে চাপা পড়ত, আর একটু একটু কাপড় মেলতে মেলতে যতই সে ডান দিক থেকে বামদিকে সরে সরে যেত, তার শরীরের দক্ষিণ ভাগ ততই অস্তোমুখ, সূর্যের অপ্রখর রঙীন আলোয় একটা স্নিগ্ধ আভায় ঝলমলিয়ে উঠত। শোভা নিজেতে নিজে আশ্চর্য সম্পূর্ণ। সেই সম্পূর্ণতার আর স্নিগ্ধ প্রশান্তির রেশ যেন সূর্যের আলো লেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তো আর নিখিলেশকে ছুঁয়ে যেত। তারের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি শোভার সমস্ত চলে যাওয়াটুকু নিখিলেশ দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করত। তারপর শোভা ঘুরে দাঁড়াতো। অস্তাচলের সূর্যের দিকে মুখ করে মাথা ঈষৎ নুইয়ে দুই হাত জোড়া করে বুড়ো আঙুলের অগ্রভাগ দুটো কপালে ছুঁইয়ে নমস্কার করত। শোভার নমস্কারের এই ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গীটি নিখিলেশের অত্যন্ত ভাল লাগত। নিখিলেশের ব্যক্তিসত্তার অনেকখানি গভীর অবধি যদি কেবল চিন্তায় ও ভাবে না ভরা থাকত, তাহলে কেবল শোভার স্নানশেষ রূপের গুণেই ওদের কাহিনী

এখানেই একটি চিরকালের নরনারীর প্রেমকাহিনীতে রূপান্তরিত হতে পারত। কিন্তু নিখিলেশ শোভাকে সে চোখে দেখত না। প্রবাদের হাঁসের মত সে কেবল দৃষ্টি দিয়ে শোভার স্নিগ্ধ সৌন্দর্যটুকু গ্রহণ করত, নারীত্বটুকু নয়। সে শোভাকে সেই চোখে দেখত, যে চোখে ভাবুক মানুষ সায়াহ্নে নদীতীরে দাঁড়িয়ে তরতরে স্রোতে ডিঙ্গী নৌকার বেয়ে যাওয়া চেয়ে দেখে অথবা ভোরে চক্রবালের কোল থেকে সহসা উঠে আসা অরুণের অরুণরাগে আকাশের অণুরঞ্জন দেখে। সেখানে রূপ আছে, উপলব্ধি আছে, আসক্তি অনুরাগের প্রশ্ন নেই।

আপনারা হয়তো মনে মনে হাসছেন অথবা সত্যই আশ্চর্য, হচ্ছেন এই ভেবে যে, এ কেমন করে হতে পারে যে, একটি বাইশ-তেইশ বৎসরের তরুণ একটি সতেরো-আঠারো বৎসরের তরুণীর গতিবিধি সপ্রশংস দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে অথচ তার মধ্যে জৈব মসলার ভেজাল নেই, এমন কি নিষ্কাম প্রেমও নেই। কিন্তু এর কারণ আমি আগেই বলেছি। নিখিলেশ পূর্ণ যুবক হলেও অনুক্ষণ তত্ত্বকথার জটিল চিন্তায় ও বুদ্ধির শুষ্ক অনুশীলনে হৃদয়ের দিক থেকে তার প্রাকৃতিক বৃদ্ধি রুখে গিয়েছিল। যে চোখে নারীকে দেখলে প্রেম জন্মায়, সে চোখ তার তৈরী হয়নি। তখন কেবল সেই মানুষই তাকে দোলা দিত যার মনের প্রধান ক্রিয়া চিন্তাশীলতা। চিন্তায় যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু নয়, বুদ্ধিতে যে সূক্ষ্ম নয়, নিখিলেশের কাছে তার আবেদন শূন্য। এইজন্য শুধু শোভা কেন, সুরেশের বন্ধুত্বকেও খুব বেশী মূল্য সে কোনদিন দেয়নি। কেবল একতরফা শ্রদ্ধা ও প্রীতির আকর্ষণে সুরেশ নিখিলেশকে নিজের কাছে টেনে রেখেছিল।

কখনও কখনও নিখিলেশ এলে সুরেশ হয়তো বাড়ী থাকতো না। কল্যাণী দোতলায় তাঁর ঘরে নিখিলেশকে ডেকে নিতেন। খুঁটিয়ে-

নাটিয়ে নিখিলেশের পরিবারের খবরাখবর নিতেন। কখনও কখনও নিজের সধবা-জীবনের গল্প করতেন। তাঁর স্বামীর শেষ অসুখের কথা এবং তিনি কি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তাঁকে বাঁচাবার জন্য সে সব গল্প করতেন। সংযত ভাষায় শান্ত ভঙ্গীতে এই বর্ষীয়সী মহিলা তাঁর বিগত জীবনের সুখ-দুঃখের এক একটি ঘটনা যখন বলতেন, নিখিলেশ কখনও শুনত, কখনও শুনত না, অন্যমনস্ক ও অস্থির বোধ করত। ঘটনাগুলো শুনতে শুনতে কল্যাণীর প্রকৃতি ও চরিত্রের এক একটা দিক, তাঁর স্বর্গত স্বামীর, এমন কি, সুরেশের ও শোভার মনের এক একটা কোণ নিখিলেশের কাছে নাটকীয়ভাবে প্রকাশ হত এবং কল্পনায় এই পরিবারের সমস্ত মানুষগুলিকে জীবন-সংগ্রামের বিচিত্র পরিপ্রেক্ষিতে নূতন করে আবিষ্কার করত। এই আবিষ্কারের ক্রিয়ায় তার বুদ্ধিবৃত্তির একটা উপভোগ্য ব্যায়াম হত এবং এইটুকুই তার ভাল লাগত। অন্যথা সে বেজার বোধ করত। শোভাও সেই ঘরে প্রায়ই থাকত। বই পড়ত, নয়তো সেলাই করতো, না হয় গালে হাত দিয়ে মার সঙ্গে নিখিলেশের কথোপকথন শুনত এবং নিজেও এক-আধটা মন্তব্য করত অথবা কোন কথা তার মাকে স্মরণ করিয়ে দিত। শোভার প্রশান্ত ভঙ্গী ও স্থির সৌন্দর্য নিখিলেশের ভাল লাগত। কিন্তু এই ভাল লাগাকে সে আমল দিত না। এই ভাল লাগার সংবাদ তার অহংকারের কাছে খুব বড় হরফে ছাপা হয়ে পৌঁছাতো না। বুদ্ধিকে গৌণ রেখেও, কেবল হৃদয়ের শ্রী ও স্বভাবের প্রসাদগুণে মানুষের ব্যক্তিত্ব যে সু-উচ্চ মহিমা লাভ করতে পারে, এ কথা নিখিলেশের তখন জানা ছিল না। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে তার কেবলই মনে হত, এরা সূক্ষ্ম নয়, এরা জিজ্ঞাসু নয়, এরা নিতান্ত সাদামাটা এবং সুরেশ আসতে দেরী করলে চেষ্টা করত, কি করে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে উঠতে পারে।

বিবাহ হওয়া অবধি নিখিলেশ ও শোভার পরিচয়ের ইতিহাস মোটামুটি এই একই ধারার। কিন্তু তবু এই বিষয়ে বলা শেষ করার আগে আমি আরও এক-আধটা ঘটনা আপনাদের শোনাবো, ওরই মধ্যে এর রকমফের এবং বিস্তৃতি যেটুকু ঘটেছিল, তা জানাবার জন্য। কল্যাণীর স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল না। মাঝে মাঝে সুরেশ মাকে ও শোভাকে নিয়ে পশ্চিমে বায়ু পরিবর্ত্তনে যেত। সেবার ওরা ঠিক করল হাজারীবাগ যাবে। নিখিলেশকে বলতেই, সে ওদের সঙ্গী হয়ে গেল। নিখিলেশের ভ্রমণের নেশা ছিল। তা ছাড়া তখন সে নিরীশ্বরবাদের পূর্ণ অনুশীলন শুরু করেছে। এক একটি অভিজ্ঞতাকে সে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বুদ্ধির সামনে উপস্থিত করছে আর বুদ্ধি তাকে নেড়ে-চেড়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়ে অচল মুদ্রার মত অগ্রাহ্য বলে খারিজ করছে। আবার সে আর একটি নূতন অভিজ্ঞতাকে বরণীয় হবে কিনা পরীক্ষা করার জন্য অস্থির হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং আবার সেই একই প্রণালী অনুসরণ করে তুচ্ছ ও মূল্যহীন বলে তাকে বর্জন করছে। হাজারীবাগে তাদের যাত্রায় সঙ্গী হবে কি না সুরেশ জিজ্ঞাসা করাতে নিখিলেশ একটা নূতন উত্তেজনার আহ্বান পেল এবং সাড়াও দিল।

একটা বড় বাড়ির দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে এরা উঠল কিন্তু দু একদিন থাকার পরই নিখিলেশ সরে গিয়ে একটা হোটেলে উঠল। নিখিলেশের কাছে কোন টাকা পয়সা নিতে সুরেশ রাজী হয়নি, একেবারে কিছু না দিয়ে দীর্ঘদিন এই পরিবারের অতিথি হয়ে থাকতেও নিখিলেশ সঙ্কোচ বোধ করল। হোটেলে থেকে নিখিলেশ সকালে ও বিকালে এদের বাড়ীতে আসত এবং একসাথে বেড়াতে বেরুত।

শরতের মিষ্টি ঝিরঝিরে হাওয়া তখন ভোরের দিকে আসন্ন

শীতের প্রভাবে রুক্ষ ও ধারালো হয়ে উঠেছে। সুরেশ একটা মস্ত পৈতামহিক ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে বেরুতো। শোভা একটা খাটো লেডিজ কোট নিত। আর ওদের মা একটা সাদাসিধে অলোয়ান গায়ে দিয়ে বেড়াতেন। কিন্তু নিখিলেশ জ্যৈষ্ঠের গ্রীষ্মে যে ধুতি পাঞ্জাবি পরত এখনও তার অতিরিক্ত আর কিন্তু গায়ে জড়াতো না। সুরেশের পরিবার ইতিমধ্যে নিখিলেশকে কিছুটা চিনেছিল, গরম কাপড় নেবার জন্য নিখিলেশকে আর অতিরিক্ত পেড়াপীড়ি করেন নি।

ওরা যখন চলত, ওদের এক পরিবারের মানুষ মনে হত। পথ চলায় সুরেশই সচরাচর নিখিলেশের পার্শ্ববর্তী থাকত। কখনও বা সে সুরেশের মার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগুতো, কখনও বা, এমন কি, শোভার সঙ্গেও। শোভার সঙ্গে চলতে চলতে ওদের যে কথাবার্তা হত, তা সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে। আবহাওয়া নিয়ে কিম্বা কোন গ্রামের নিকট দিয়ে গেলে ক্রীড়ারত নগ্ন ধূলামাখা শিশুদের ব্যবহার ও দৈন্য নিয়ে, নয়তো পূর্বের চক্ররেখায় পথের দুধার থেকে দেওদার শাখা উঠে যেখানে খিলান রচনা করেছে তার অন্তরালে নবীন সূর্যের মহিমা ও সৌন্দর্য নিয়ে। শোভা নিজে বিশেষ কথা বলত না, মধ্যে মধ্যে নিখিলেশের দিকে মুখ ফিরিয়ে তার কথা শুনত, আর বড় বড় ভাসা-ভাসা চোখের আলোয় তার হৃদয়াবেগ প্রতিফলিত হত। নিখিলেশ সেই আলোয় তার নিজের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের ভাষা পাঠ করত। কিন্তু তবু শোভার সঙ্গ তার অধিকক্ষণ ভাল লাগত না। ব্যক্তিত্ব থাকলেও শোভা সামান্য। শ্রীমতী হলেও সে স্থূল, রুচি থাকলেও সে সংস্কৃতিহীনা। বুদ্ধির ঔদ্ধত্যে নিখিলেশ শোভা সম্বন্ধে এর চেয়ে উচ্চতর ধারণা মনে নিতে পারত না। কিছুক্ষণ ধীরে চলে পিছন থেকে সুরেশের মা এবং

সুরেশ এগিয়ে এলে সে জায়গা বদলে আবার সুরেশের পার্শ্ববর্তী হয়ে চলতে শুরু করত।

মাসখানেক থাকার পর সুরেশের মার কিছু স্বাস্থ্যোন্নতি হলে ওরা ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করল। এবং যাওয়ার পূর্বে ওই অঞ্চলে দ্রষ্টব্য যা কিছু দেখে নেওয়ার তাড়ায় ওরা একদিন সকলে মিলে ট্যাক্সি করে হুড্রু ফলস্ দেখতে চলল। ওখান থেকে অনেকে হুড্রু দেখতে যায় বটে, কিন্তু অনেক দূর, পথের ধকল সহ্য করতে পারবেন কি না সে সম্বন্ধে কল্যাণীর যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল, কিন্তু তবু নিখিলেশ ও সুরেশের আগ্রহাতিশয্যে তিনি ওদের সঙ্গী হতে অরাজী হতে পারলেন না।

পঞ্চাশ বাহান্ন মাইল উঁচু নীচু মোটরের পথ। স্থূল জগতে প্রকৃতির ভাঁড়ারে যতকিছু রূপ, রঙ, সৌন্দর্য ও বিস্ময় মজুত আছে, সমস্ত এই পথের দুধারে উদার হস্তে ছড়ানো। শুধু নিখিলেশ নয়, চাপা সানন্দ উত্তেজনায় গোটা দলটাই এই যাত্রা উপভোগ করল। গাড়ীর গতি আর মথিত বায়ুস্তর থেকে ঠেলে আসা ঠাণ্ডা সশব্দ ঝড়ো হাওয়ার উৎপীড়নে গাড়ীর মধ্যে ওদের বিশেষ কথা বলাবলি হল না। কিন্তু মধ্যপথে কিছু খেয়ে নেবার জন্য ওরা যখন লারিতে নেমে চালাঘরের একটা গ্রাম্য পান্থশালায় উঠল, তখন সকলেই, এমন কি, শোভা অবধি শিশুর মত চঞ্চল, মুখর ও কৌতুকময় হয়ে উঠল। পান্থশালার আশে পাশে উলুখাগড়ার জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটি মোরগ ও মুরগী চরে বেড়াচ্ছিল। তাদের ডাক শুনে নিখিলেশ চীৎকার করে বললে, মানুষের ভাষা ভয়ানক খাটো। ভরপুর আনন্দকে ভাষা দিয়ে কিছুতেই প্রকাশ করা যায় না। ওই মুরগীগুলোর মত সহজ অর্থহীন ধ্বনি তুলে আমরা আনন্দ জ্ঞাপন করব। বলে গলা ফুলিয়ে প্রচণ্ড চীৎকারে মুরগীর ডাকের অনুকরণে ধ্বনি তুলে নিখিলেশ

কিছুক্ষণ সাড়া শব্দ তুলল। তারপর সুরেশের মাকে সালিশি মেনে শোভা ও সুরেশের সংযম, সঙ্কোচ ও শৃঙ্খলাকে তীক্ষ্ণ ভাষায় ব্যঙ্গ করলে লাগল। কল্যাণী হাসতে লাগলেন, তারপর শোভাও হেসে উঠল! অষ্টাদশী তরুণীর সেই প্রাণখোলা অকৃত্রিম হাসি চারিপাশের সুদূর দিগন্তছোঁয়া প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়ে অনাবিল আনন্দের যে কম্পন সৃষ্টি করেছিল, সুরেশ যতই বলুক, তার কোন প্রভাব নিখিলেশের অবচেতন মনে থেকে যায়নি—এ কথা আমি মানতে পারি না।

মোটরের পথ শেষ হলে পাহাড়িয়া উঁচু জমির ওপর দিয়ে মাইল সাতেক হাঁটা পথ। তারপর ক্ষীণতোয়া সুবর্ণরেখার কোমর অবধি জলে শরীর ডুবিয়ে নদী পার হওয়া। তারপর ওরা যখন সেইখানে এসে পৌঁছুলো যেখান থেকে প্রায় চারশো ফুট পাথরের ধাপে ধাপে নেমে জলপ্রপাতের ধারে এসে পৌঁছানো যায়, তখন কল্যাণীর শরীর একেবারে অচল হয়েছে। একটা ছোট কাঁঠালগাছের তলায় শুকনো ঘাস আর কাঁকরভরা জমির ওপর সতরঞ্চ পেতে ওরা অল্পক্ষণ বিশ্রাম করল। সুরেশ মার কাছেই রইল। নিখিলেশকে অনুরোধ করল, শোভাকে প্রপাত দেখিয়ে আনতে।

অবরোহণ খুব কঠিন নয়। কিন্তু শ্রমসাধ্য। নিখিলেশ ধীরে ধীরে নামতে লাগলো শোভার অবরোহণের ওপর চোখ রেখে রেখে। শোভা আঁচল কোমরে বেঁধে নিয়েছিল, জুতো ওপরে ছেড়ে এসেছিল, তবু খুব অনায়াসে নামতে পারছিল না। তার পরণে আজও সেই সাদা শাড়ী, পাড়ে ফুল নয়, মন্দির ছাপা। শোভা নামছিল, নিখিলেশের নজর পড়ছিল শোভার পায়ের দিকে। দুপাশে আলতার গাঢ় রাঙা ছোপ। আঙুলগুলো খুব কাছাকাছি ঘেঁষা, ঈষৎ লম্বা, যে লাবণ্য তার মুখে, সে লাবণ্য পায়ের ত্বকেও। চলনের সুবিধার

জন্য শোভা মাঝে মাঝে শাড়ী একটু গুটিয়ে নিচ্ছিল, পায়ের ডিম অবধি তখন অনাবৃত হয়ে পড়ছিল। ওখানটা প্রায় গৌরবর্ণ, সুগোল, সুপরিস্ফুট। মাঝে মাঝে নিখিলেশ চোখ তুলে শোভার মুখের দিকে দেখছিল। গতির শ্রমে তার কপাল হঠাৎ কুঞ্চিত হয়েছে। এক আধগাছা চুল শিরশয্যা থেকে দাঁড়িয়ে উঠে বাতাসে দুলছে, কখনও বেতালে পা পড়লে নিখিলেশের দিকে চেয়ে অপ্রতিভ ভঙ্গীতে সে হাসছে। কিন্তু তবু এই তরুণীর ভিতরটা যে অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও শান্ত, ওই গতির মধ্যেও সে পরিচয় একেবারে চাপা পড়ে যায়নি। একটা গড়ানে পাথরে এসে শোভা কিছুতেই কেবল পায়ের ওপর ভর রেখে চলতে পারল না। বসে পড়ে দুই হাত পাথরের ওপর দিয়ে সে এগুতে যাচ্ছিল, নিখিলেশ এগিয়ে এসে তার হাত ধরে পরের ধাপে নামিয়ে দিল। এই অপ্রত্যাশিত করস্পর্শে শোভা ঈষৎ রক্তিমাভ হল। তারপর থেকে প্রতি ধাপেই শোভার হাতে হাত দিয়ে নিখিলেশ উত্তরণে সাহায্য করতে লাগল। ওরা যখন প্রপাতের ধারে প্রকাণ্ড একটা পাথরের ওপর এসে পৌঁছুলো, সেই বিরাট গুরু-গম্ভীর প্রাকৃতিক বিস্ময়ের সামনে দু'জনেই কিছুক্ষণের জন্য বাক্যহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

দেখতে দেখতে শোভা দু-হাত তুলে প্রপাতের উদ্দেশ্যে নমস্কার করল। নিখিলেশ একটু অবাক হয়ে কৌতুকভরা দৃষ্টিতে শোভার দিকে চেয়ে রইল। জিজ্ঞাসা করল, এটা কি ? নমস্কার কেন ?

শোভা আরও কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে থেকে তারপর হাত দুটো নামিয়ে নিখিলেশের দিকে ফিরে বললে, এটা আমার অভ্যাস। মানুষের মধ্যে বা প্রকৃতিতে বিরাট কিছু দেখলেই আমার নিজের অসম্ভব ক্ষুদ্রতার কথা মনে পড়ে আর হাত দুটো আপনিই নমস্কারে গুটিয়ে আসে।

নিখিলেশ উড়িয়ে দিলে। বললে, বাজে কথা। তোমার মা দিদিমা ওই রকম শিখিয়েছে, তাই তুমি যা তা দেখে নমস্কার কর। সকলে সূর্যকে উদয়ের সময় নমস্কার করে। আমি দেখেছি, সূর্য যখন অস্ত যায়, তখনও তুমি জোড়া হাত কপালে ঠেকাও।

শোভা তাড়াতাড়ি কিন্তু শান্ত ভাবেই প্রতিবাদ করল। বললে, না না, এ আপনার একেবারে ভুল। আমার মা খুব পূজা জপ ধ্যান এসব করেন বটে, কিন্তু একেবারে নিজের মধ্যে নিজে। আমাকে বা দাদাকে কখনও এর মধ্যে টানেন না।

হুড়্ দেখতে তখন আরও কয়েকজন এসেছিল। তারা আশে-পাশে কাছাকাছির মধ্যেই দাঁড়িয়েছিল। নিখিলেশ বুঝলে শোভা লোকজনের মাঝে বেশী কথা বলতে সঙ্কুচিত হচ্ছে। তবু ছাড়লে না। বললে, কিন্তু এ তো জড়। দেখছ না, পড়বার আগে নদী কত নিস্তেজ। শুধু হঠাৎ অতখানি নীচে পড়ছে বলে অমন গুরুগম্ভীর শব্দ আর দুধের ফেনার মত রং। বাড়ীর তিনতলার ছাদে যদি বৃষ্টির জল জমে আর সেই জল নালি দিয়ে হঠাৎ ছেড়ে দেওয়া যায়, পড়বার সময় তা'তেও অনেকটা এই ধরণের শব্দ হয়, কিন্তু তাই বলে আমরা নালিকে কেউ নমস্কার জানাই না।

একমুহূর্ত শোভার মুখটা ঈষৎ কালো হয়ে উঠল। অল্পক্ষণ সে চুপ করে রইল যেন নিখিলেশের এই টিট্‌কারীর সে জবাব দেবে না। কিন্তু বোধ করি নিখিলেশকে উত্তরের প্রতীক্ষায় তার দিকে স্মিত মুখে চেয়ে থাকতে দেখেই ধীরে ধীরে উত্তর দিল। বললে, খুব বড় কোন জিনিসকেই খুব ছোট কোন জিনিসের সঙ্গে তুলনা দিয়ে বিচার করা উচিত নয়। চৌবাচ্চাও জলাশয়, সমুদ্রও জলাশয়, কিন্তু চৌবাচ্চার দিকে চেয়ে কেউ যদি সমুদ্রকে বুঝবার বা বোঝাবার চেষ্টা করে, তাহলে তার বুদ্ধির দৈন্যই প্রকাশ পায়, সত্য ধরা পড়ে না।

কথাটা বলে শোভা লঘুভাবে ঈষৎ হেসে উঠল। তার কৌতুক লাগলো যে, নিখিলেশের মত বিদ্বান মানুষের সঙ্গেও সে এমনভাবে তর্ক করতে সাহস করছে। নিখিলেশ কিন্তু আশ্চর্যই হল। শোভার চোখে চোখ রেখে সে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল এবং এই প্রথম তার চোখের আলোর সমঝদারের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ফুটে উঠল। তারপর ঈষৎ খেদের স্বরে বললে, আমার খুব বেশী মেয়ের সঙ্গে আলাপ নেই শোভা। কিন্তু যে কয়জনের কাছাকাছি এসেছি, দেখেছি তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী সেও প্রাচীন সংস্কারের টানে সত্য থেকে অনেক পিছনে। চৌবাচ্চা কেন, ঘরের কলসী কুঁজো, কিম্বা হাতের এক আঁজলায় যেটুকু জল ধরে, তাই দিয়েই জলের সাধারণের প্রকৃতি বিচার করতে হয়। প্রশান্ত মহাসাগরে যত জল আছে, তার প্রত্যেকটি জলকণাও যদি পৃথক পৃথক করে বিশ্লেষণ করা যায়, দু এটমের বেশী হাইড্রোজেন পাওয়া যাবে, এক এ্যাটমের বেশী অক্সিজেন মিলবে না। সত্যকে জানতে হলে সারটুকু বিচার করতে হয়, কেবল আয়তন দেখে যে বিস্ফারিত নেত্র হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সে যথেষ্ট হৃদয়াবেগের পরিচয় দেয়, বুদ্ধির নয়।

এ কথার আর শোভা কোন জবাব দিল না। তর্কের মধ্যে তার মুখে চাঞ্চল্যের যেটুকু অভিব্যক্তি এসে পড়েছিল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তা সরে গিয়ে তার সহজ স্নিগ্ধ গভীর প্রশান্তি মুখের ওপর নেমে এল। নিখিলেশ তার বাক্স থেকে ক্যামেরা বার করে খানিকক্ষণ তার কাচের ওপর চোখ রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখলো, তারপর হঠাৎ 'আমি একটু এগিয়ে যাই' বলে শোভার কাছ থেকে সরে সমুখ দিকে এগিয়ে গেল।

শোভা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিখিলেশের সঙ্গে অকারণ প্রগল্ভতার সঙ্গে তর্ক করছিল বলে নিজের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হল। তারপর

প্রপাতের সেই আদিঅন্তহীন মেঘগম্ভীর শব্দ আর বিশাল মেঘরাশির দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ নিজেকে একেবারে ভুলে গেল। যখন চারিদিকে আবার নজর পড়ল, দেখল নিখিলেশ অনেকখানি এগিয়ে গেছে, জলরাশি যেখানে উন্মত্ত বেগে উপর থেকে নীচে প্রথম ধাপে পড়ছে, তার একেবারে কাছাকাছি একটা ছোট পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে সে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই দিকেই চেয়ে আছে। ক্যামেরা হাতে নেই, কাঁধেই ঝোলানো। যে পাথরটার ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে সেটা খুব ছোট। তার ক্ষীণ জলধারা তার দুপাশ ছুঁয়ে যাচ্ছে। প্রপাতের জলের ছিটে লেগে তার ওপরটাও রীতিমত ভিজে এবং পিছল। একটু অসাবধান হলে, একবার পা টললে সে হড়কে প্রপাতের প্রধান ধারার মধ্যে পড়ে পর্বতপ্রমাণ জলরাশির চাপে নিষ্পিষ্ট ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

শোভা ভয়ে শিউরে উঠল। কিছু না ভেবেই সে কয়েক পা এগিয়ে আর একটা পাথরের ওপর এসে চেঁচিয়ে ডাকল, নিখিলেশদা! বাতাস ভরে কেবল জলপ্রপাতের গুরুগম্ভীর শব্দ। শোভার ডাক বোধকরি নিখিলেশের কানে গেল না। সে প্রপাতের দিকে চেয়ে সমাহিত ভঙ্গীতে যেমন দাঁড়িয়েছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। প্রচণ্ড বাতাসে নিখিলেশের ধুতি আর পাঞ্জাবির আস্তিনগুলো ঝটপট করে উড়ছে। নিখিলেশ এবার শুনতে পেল। ডান হাত তুলে শোভাকে নিরস্ত হতে ইঙ্গিত করল। তারপর সামনের দিকে চেয়ে একটু দেখে শুনে একলাফে আরও আগের একটা পাথরের ওপর উঠে দাঁড়ালো। শোভা আবার চেঁচিয়ে বললো, নিখিলেশদা, ফিরে আসুন, আর এগুবেন না! ফিরে আসুন!

কাছাকাছি আর যারা দাঁড়িয়েছিলেন, শোভার চেঁচামেচিতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা অনেকেই সেদিকে এগিয়ে গেলেন। শোভাকে

ঘিরে বেশ একটু ভিড় জমে গেল। নিখিলেশ যেখানে গিয়ে পড়েছিল, প্রপাতের ততখানি কাছে যাওয়া সত্যই বিপজ্জনক এবং শোভা অকারণ ভয় পায়নি। শোভার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভিড়ের মধ্য থেকে দু একজন তরুণও যতদূর সাধ্য চীৎকার করে নিখিলেশকে ডাকতে লাগল। দু একজন শোভার কর্ণগোচরেই মন্তব্য করতে লাগল, এ ছোকরা তো দেখছি পাগল! আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে নাকি। দু একজন বা শোভাকে তরুণী এবং নিখিলেশকে অত্যন্ত তরুণ দেখে ঈষৎ তফাতে গিয়ে ওদের কল্পিত রসের সম্পর্ক নিয়ে কানাকানি করতে লাগল। কিন্তু শোভার তখন পারিপার্শ্বিকের চেতনা লোপ পেয়েছে। ইতিমধ্যে নিখিলেশ আরও এক লাফে প্রপাতের আরও কাছাকাছি আর একটা পাথরে উঠে পড়েছে। উপর থেকে যে জল-স্রোত পর্বতের মত ভার হয়ে উন্মত্ত বেগে নীচে আছড়ে পড়ছে আর লাখ লাখ সাপের ফণার মত ফেনিয়ে উঠছে, তার এক একটা ভাঙা ধারা সেই পাথরটার কখনও দক্ষিণ কখনও বাম দিক দিয়ে বেশ বেগে চলে যাচ্ছে। শোভার মনে হল এবার যে পাথরে নিখিলেশ দাঁড়িয়েছে, সেটা মৃত্যুর চৌকাঠ। চিত্তের ব্যাকুলতায় পাগল হয়ে সে চারিপাশের জনতার দিকে চেয়ে হু হু করে কেঁদে ফেলল। হাত জোড় করে বলল, আপনাদের পায়ে পড়ি, কেউ যান। নিখিলেশদাকে ফিরিয়ে আনুন।

যাবার মত কেউ ছিল না। কিন্তু একটু পরেই নিখিলেশ ফিরে দাঁড়ালো। প্রপাতের প্রচণ্ড শব্দ ছাপিয়ে শোভার এবং জনতার সমবেত চীৎকার তার কানে গেলেও শোভা যে ভয় পেয়ে এমন একটা কাণ্ড পাকিয়ে তুলেছে সে বোঝেনি। এখন এদিকে চেয়ে আর শোভার ব্যাকুল মুখভঙ্গী দেখে সে পরিস্থিতি অনুমান করল। প্রপাতকে পিছনে রেখে নিখিলেশ ফিরে দাঁড়ালে তাকে অত্যন্ত সুন্দর

দেখাচ্ছিল। গম্ভীর, স্তব্ধ, সমাহিত, প্রপাতের বিশাল সৌন্দর্যের নেশায় যেন নেশাচ্ছন্ন তার মুখ। সৃষ্টির মধ্যে যেখানেই রূপ আপন সৌন্দর্যের মহিমায় অরূপের চিরন্তন বাণী বহন করেছে, চিন্তাশীল মানুষ সেখানেই প্রথম এসে নিজেকে এমন করে হারিয়ে ফেলেছে। পিছনে দুধের চেয়ে সাদা উত্তুঙ্গ ফেনরাশি, তারও পিছনে ঘন জঙ্গল, তার ফাঁকে ফাঁকে যেন দিগন্ত অবধি সুড়ঙ্গ কাটা, চারিপাশে দুপুরের রৌদ্রদগ্ধ আকাশের বিশাল উদাস বিস্তার, এদিকে অনাদিকালের স্মৃতির সাধক একটানা ছন্দোবদ্ধ মেঘগম্ভীর শব্দের সম্ভার—এই পট-ভূমিতে নিখিলেশ যখন হঠাৎ সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়ে শোভার দিকে ফিরে দাঁড়ালো, তখন তার যা অবস্থা তার সঙ্গে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশধারী শিব যখন তপস্যারতা পার্বতীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে হঠাৎ ছদ্মবেশ ছেড়ে আপন স্বরূপ প্রকাশ করলেন তখন পার্বতীর যে অবস্থা তার সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা হয়। শোভা ভয় পেয়ে কত কিই ভাবছিল। নিখিলেশ যখন তার দিকে একেবারে ঘুরে দাঁড়ালো শোভার সমস্ত ভয় অকস্মাৎ একেবারে মিলিয়ে গেল। নিখিলেশ আর একবার পিছন ফিরে ক্যামেরা বার করে ওইখান থেকে ছবি তুললে, তারপর কয়েকটা দ্রুত লাফে চার পাঁচটা পাথর পেরিয়ে শোভার পাশে এসে উপস্থিত হল।

যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তাদের তিরস্কার এবং প্রশ্নবাণ উপেক্ষা করে নিখিলেশ সহজভাবে শোভার পিঠে হাত দিয়ে বললে, চল, ফিরে যাই। ফেরবার পথে সে এই ঘটনা নিয়ে কোন কথাই বললে না। শোভাও না। আরোহণের সময় সে শোভার হাত ধরে তাকে উঠতে সাহায্য করল। তাকে চিন্তিত এবং ঈষৎ বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। উত্তেজনার পর শোভাও লজ্জা ও সঙ্কোচে অভিভূত হয়েছিল। তার আশঙ্কা হচ্ছিল নিখিলেশ হয়তো তাকে তিরস্কার

করবে তার মাত্রাহীন ভয়ের জন্য। পরিশ্রান্ত শোভা ধাপগুলি উঠবার সময় কল্পনায় যেন নিখিলেশের তীক্ষ্ণ তিরস্কার শুনতে পেল। আরও কত কি শুনতে পেল, নিখিলেশ বলে যাচ্ছে, প্রপাতের গর্জনের মত শব্দময় কিন্তু অর্থহীন। যেন তাদের বাড়ীতে আসার শুরু থেকে সুরেশের সঙ্গে যত কথা নিখিলেশ বলেছে, যত কথা তার মার সঙ্গে তার নিজের সঙ্গে বলেছে, সমস্ত একাকার হয়ে বাণী হারিয়ে অর্থ হারিয়ে গম্ভীর একটানা ছন্দের ধ্বনি হয়ে আবার নিখিলেশের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে। সে সব কথা প্রপাতের গর্জনের মত অর্থহীন কিন্তু নির্ভুল ও অমোঘ।

সুরেশের মা অনেকটা সুস্থ হয়েছিলেন। শোভা এবং নিখিলেশ ফেরা মাত্রই ওঁরা প্রত্যাবর্তনের জন্য উঠে পড়লেন।

এর কয়েক বছর পরে সুরেশের মা মারা গেলেন। নাস্তিক্য-বাদের ঘোর লজিক নিখিলেশকে তখন অধঃপাতের শেষ পর্যায়ে এনে ফেলেছে। শ্রাদ্ধে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেও আসেনি। সুরেশের সঙ্গে তার যোগাযোগ তখন খুব কম। মাঝে মধ্যে লোকমুখে কিম্বা কোন সাধারণ বন্ধু মারফত কিম্বা নিখিলেশ প্রেরিত দূতের কাছ থেকে খবর পেয়ে সুরেশ তাকে শুঁড়িখানা অথবা খাস বেশ্যাবাড়ী অথবা একেবারে মাঠ-ময়দান থেকে ঘোর মাতাল অবস্থায় তুলে এনে হয় তার বাড়ী পৌঁছে দেয়, নয় অবস্থা তেমন খারাপ হলে, নিজ বাড়ীতেও নিয়ে আসে। শোভা জানত না। একদিন নিখিলেশ এসেছিল সুরেশের কাছে বোধ হয় ধারকর্জ কিছু করতে। শোভা যথারীতি জলযোগের প্লেট এবং চায়ের পেয়ালা নিয়ে দিতে গেলে নিখিলেশ তার দিকে ভাল করে চেয়ে জোরে ঘাড় নেড়ে বললে, আমি

এখন এ সব কিছু খাব না। নিয়ে যাও, প্লিজ। তার ব্যবহারে শোভা ঈষৎ ক্ষুব্ধ হল এবং সে চলে গেলে সুরেশকে জিজ্ঞাসা করল নিখিলেশের কোন অসুখ করেছে নাকি। সুরেশ বললে, অসুখ নয়। নিখিলেশ প্রচুর মদ খেয়েছে। তাই অমন চেহারা।

শোভা অত্যন্ত আশ্চর্য হল। পাংশু মুখে বলল, মদ খেয়েছেন!

হ্যাঁ, সুরেশ সোজাসুজি জবাব দিল। ও আজকাল প্রায়ই মদ খায়। আরও যে কত কি কাণ্ড করে সে আর তোর শুনে কাজ নেই। ঠিক যে কেন এসব করে তা জানি না। কারণ যেটুকু বুঝতে পারি তা মনে মনে। ভাষায় ব্যাখ্যা করার শক্তি আমার নেই।

এক একদিন সুরেশ অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরতো, সঙ্গে নিখিলেশকে নিয়ে। শোভা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে সুরেশ শোভাকে তুলতো। নিখিলেশ অর্ধ অচেতন, ওরা ভাই বোনে ধরাধরি করে নিখিলেশকে চৌবাচ্চার ধারে নিয়ে যেত। একটা টুলের ওপর বসিয়ে শোভা তার মাথায় জল ঢালতো। তখন শোভার কাছে কিছু সঙ্কোচ নেই, কিছু মনে করাকরির প্রশ্ন নেই। অসীম মায়া আর করুণা যেন জলের রূপে শোভার হাত থেকে নিখিলেশের মাথায় গায়ে বর্ষিত হত। কখনও বালতি করে জলের ধারা ঢালত। কখনও দুহাতের আঁজলায় জল ভরে থুপিয়ে থুপিয়ে নিখিলেশের বড় বড় ঘন চুলের মধ্যে চাপড়ে দিত। একটু চৈতন্য হলে নিখিলেশ হয়তো কখনও বাংলায় কখনও ইংরাজীতে প্রলাপোক্তি করত। কখনও ভেউ ভেউ করে কেঁদে ভাসাতো। শোভা ও সুরেশের মায়াময় যত্ন ও সেবায় ভাল করে চেতনা এলে সে উঠে বসে ওদের ধন্যবাদ দিয়ে তখনই বাড়ী রওনা হত, আর ভাল করে চেতনা না এলে সে রাত্রিটা ওদের ওখানেই কাটাতো।

বিবাহের পূর্ব্বে শেষ নিখিলেশ যেদিন ওখানে আসে, সেদিন

সুরেশ তখনও ফেরেনি। রাত্রি প্রায় এগারোটা। কড়া নাড়াতেই শোভা এসে দরজা খুলে দিল। নিখিলেশকে নিয়ে ওদের দোতলার বড় ঘরে বসাল। নিখিলেশ সেদিনও পান করেছে যথেষ্ট, কিন্তু উন্মত্ততা কম। শোভা একটা মাসিক পত্রিকা নিখিলেশের হাতে দিয়ে বললে, আপনি একটু বসুন। দাদা নেই, বোধ হয় এখনই এসে পড়বে।

শোনামাত্রই নিখিলেশ পত্রিকা রেখে দিয়ে উঠে পড়ল। বললে, সুরেশ নেই, আমি এখন যাই।

শোভা তাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল অপেক্ষা করার জন্য। তার আশঙ্কা হল, নিখিলেশ যদি এখনই চলে যায়, হয়তো আবার শুঁড়িখানায় ঢুকবে, সারারাত্রি পান করবে।

নিখিলেশ রাজী হল না। বললে, তা হয় না, তুমিও জান, তা হয় না।

শোভা বিস্মিত হয়ে বললে, কেন?

কেন কি? বিরক্ত হয়ে নিখিলেশ বললে, বাড়ীতে সুরেশ নেই, তুমি একা, আমার এই অবস্থা। আমার এখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা ভাল দেখায় না। সুরেশই বা কি মনে করবে।

সে কি কথা? শোভা সরলভাবে বললে, দাদা কি মনে করবে? দাদা কি সেই মানুষ?

না না, সেই মানুষ নয়, জানি। নিখিলেশ চীৎকার করে উঠলো, কিন্তু আমিই কি সেই মানুষ আছি?

শোভা আহত না হয়ে নিখিলেশের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। তার চোখ আজও লাল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দু একদিন ক্ষৌরী হয়নি। দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা উদ্ধত। তারপর আস্তে আস্তে বললে, আপনি সেই মানুষই আছেন। দাদা তাই জানে। আমিও তাই মনে করি।

কেমন করে? নিখিলেশ প্রশ্ন করল। সে নেশার মধ্যে ছিল। প্রশ্নটা করেই সে নিজের মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। বললে, কেমন করে জানলে আমি সেই মানুষই আছি। কিন্তু এ তোমার স্বীকৃতি নয়, সহানুভূতি। আমি মাতাল, জুয়াড়ী, লম্পট,—এ কথা তোমরা জান। আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করে তোমার মহত্ত্বের বিজ্ঞাপন দিচ্ছ। নিজেদের সংযত সুশৃঙ্খল সাবধান জীবনের ছায়ায় বসে বিশৃঙ্খল অপ্রকৃতিস্থ জগতের কষ্ট আর অস্থিরতা দেখে করুণায় বিগলিত হওয়া তোমার আর সুরেশের একটা নিষ্ঠুর নেশা। কিন্তু তোমরা জেনে রেখো, আমি তোমাদের করুণা পাবার যোগ্যতা এখনও অর্জন করতে পারিনি। আমি যে আজ অনেক নীচে নেমেছি, তার কারণ বস্তুর সন্ধানে আমি ত্রিভুবন মানস পরিক্রমায় বেড়িয়েছি। এই পরিক্রমার গতিই আমাকে আজ নীচে নামিয়েছে। আমি এখন সমুদ্রের তলে। তিমি, হাঙ্গর আর অকটোপাস এরাই এখন আমার সাথী। কিন্তু এ থাকবে না! আমি আরও অনেক তলায় নামব। অতল তলে। তারপর মানিক পাব। সাত রাজার ধন এক মানিক। সেই মানিক মিললে জীবন অমূল্য। না মিললে মাটির ভাঁড়ের মত মূল্যহীন। তুমি সুরেশকে বলে দিও, আমি যেখানেই থাকি, যেমন ভাবেই থাকি, তাকে কষ্ট করে আমাকে তুলে নিয়ে আসতে হবে না। আমার দুঃখে সমবেদনা জানাতে হবে না। তার এই আচরণ আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি।

উত্তেজনায় নিখিলেশ একটু একটু কাঁপতে লাগলো। শোভা নিখিলেশের হাত ধরে বললে, আপনাকে অনুরোধ করছি, এখন যাবেন না, একটু স্থির হয়ে বসুন, দাদা এলে যা হয় করবেন।

না, বলে নিখিলেশ হাত ছাড়িয়ে নিল এবং আর একটুও না দাঁড়িয়ে দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। শোভা ব্যাকুল স্বরে

আবার বললে, যাবেন না নিখিলেশদা। আমি দাদাকে কি বলব ? কি কৈফিয়ত দেব দাদাকে ?

সদর দরজায় জোরে শব্দ করে নিখিলেশ রাস্তায় নেমে গেল। শোভা তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে এসে জানালার ধারে দাঁড়ালো। রাস্তার আলোয় দেখল, অপ্রকৃতিস্থ চরণপাতে নিখিলেশ যথাসম্ভব দ্রুত পার্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একটু পরে পার্কের মধ্যে একটা গাছের আড়ালে সে মিলিয়ে গেল।

এই ঘটনার মাস দেড়েক পরে সুরেশ শোভার কাছে লিখিলেশের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করে এবং শোভা সম্মতি জানায়।

সুরেশ প্রথম প্রথম খুব ভয় পেয়েছিল। ভেবেছিল একটা স্বভাব-বিরোধী কাজ করতে গিয়ে বুঝি শোভার জীবনটাই ব্যর্থ করে দিল। কিন্তু কয়েক মাস যাবার পরই দেখা গেল ঘটনা একেবারে বিপরীত। তার আশা তো সফল হয়েছেই, অত্যন্ত আশাতীতভাবে সফল হয়েছে। বিয়ের পর তিন চার মাসের মধ্যে নিখিলেশের আচার-ব্যবহার একেবারে বদলে গেছে এবং সুরেশবাবু এই বিবরণ বলতে গিয়ে তার সম্বন্ধে ঠিক 'স্ত্রৈণ' বিশেষণটা না প্রয়োগ করলেও আমি তাঁর কথায় বুঝলাম, নিখিলেশ শোভার একান্ত অনুরাগী হয়ে উঠেছে।

শোভা যে যাদু জানত, তা নয়। শোভার বিপরীত প্রকৃতির মধ্যে অস্থির-চিত্ত নিখিলেশ যেন একটা আশ্রয় পেল। শোভা ধীর, স্থির, শান্ত, সংযত, মমতাময়ী আর, সকলের ওপর, অত্যন্ত ব্যবস্থিত-চিত্ত। আর নিখিলেশ নিজের চিন্তার অক্ষে লাট্টুর মত অবিরাম ঘুরছে। শোভার মধ্যে সে যেন তার মানসিক ব্যাধির একটা হাসপাতাল পেয়ে গেল।

শোভার পড়াশোনার দৌড় খুব বেশীদূর ছিল না। বিদ্যা, বুদ্ধি বা জ্ঞানে সে কোনদিক থেকেই নিখিলেশের সমকক্ষ নয়। কিন্তু নিখিলেশের সে জন্য এতটুকু ক্ষোভ ছিল না। এদিক থেকে সে একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অনেক সময় সে নিজের চিন্তার গরমে শোভার সঙ্গে বুদ্ধি-গর্ভ আলোচনা ফেঁদে বসত। অনেকক্ষণ একতরফা বক্তৃতা করে যেত। শোভা জবাব বিশেষ দিত না। কেবল মুখে একটু হাসির রেখা নিয়ে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে নিখিলেশের কথা শুনে যেত। বলার ফাঁকে ফাঁকে নিখিলেশ যেন ভিতরে ভিতরে অনুভব করত, শোভা তার কথা মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝুক বা না বুঝুক, হৃদয় দিয়ে, এমন কি, সমস্ত শরীর দিয়ে তার বক্তব্য গ্রহণ করছে। কদাচ কখনও শোভা নিজে কোন মন্তব্য প্রকাশ করলে নিখিলেশের কাছে সে মন্তব্য অদ্ভুত যুক্তিযুক্ত মনে হত এবং লেখার বিষয় হলে সে মন্তব্য তার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নিত।

ভালবাসার অঙ্কুর কবে লতায় পাতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, নিখিলেশ অত খেয়াল করেনি। তারপর শোভা একবার দিল্লীতে তার আত্মীয়ের বাড়ী কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গেল। নিখিলেশ তখনই বুঝতে পারল, শোভা তার জীবনে কতদূর অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। আকাশে এলো-মেলো ঘুরতে ঘুরতে এক একটা জ্যোতিঃপুঞ্জ যেমন হঠাৎ সূর্যের মাধ্যকার্ষণে পড়ে একটা সুনির্দিষ্ট গতি পায়, শোভার শান্ত অনাড়ম্বর আকর্ষণ তেমনি নিখিলেশের অস্থির ঘূর্ণায়মান চিত্তে একটা বিধিবদ্ধ গতি এনে দিয়েছিল। শোভার অনুপস্থিতিতে মাধ্যাকর্ষণ একটু টলে যাওয়ায় নিখিলেশ ঠিক বুঝতে পারল শোভা তার কাছে কতখানি। না হলে, সৃষ্টির ওপর তার গভীর অবিশ্বাস ইতিমধ্যে কিছু টলে যায়নি।

একবার শোভাকে নিজের জীবনের কেন্দ্র বলে পাকা করে

নেওয়াতে নিখিলেশের যুক্তিপ্রিয় মনের কাছে কতকগুলো জিনিস অত্যন্ত সহজ হয়ে গেল। প্রথমত, এক রাত্রের সংকল্পে নিজের উচ্ছৃঙ্খল অভ্যাস এবং উচ্ছৃঙ্খল সঙ্গ একেবারে বর্জন করল। গৃহস্থদের যে ভদ্র জীবনকে সে একান্ত ঘৃণা করত, নিজে সেই ভদ্রের শিরোমণি হয়ে উঠল। সুস্থ শান্ত জীবন যাপন করতে যে শৃঙ্খলার প্রয়োজন হয়, সে আর এখন তার কাছে শৃঙ্খল বলে মনে হল না। দিন কতক নিজের পুরানো কলেজে উমেদারী করে একটা প্রফেসারি জুটিয়ে নিল। কলেজ, লাইব্রেরী, দু'-একজন বুদ্ধিপ্রধান বন্ধুর সঙ্গ এবং বাড়ী—এই হল তার নূতন জীবনের রুটিন। শোভা ফিরে এলে যৌথ সংসারে নিজের সম্পত্তির অংশ বেচে দিয়ে সে শহরতলিতে একটা ছোটখাট বাড়ী কিনে উঠে গেল।

বাড়ীটা ছোট হলেও বেশ ছিমছাম। খান চারেক ঘর, ছোট একটু দালান, একটুখানি উঠোন, খানিকটা বাগান। জিনিসপত্র গোছগাছ করে ভাল করে সংসার পত্তন করার পর দেখা গেল শোভার নিপুণ হাতে গৃহের অপরূপ শ্রী খুলেছে। বাগান একটু যা ছিল, জঙ্গল হয়ে উঠেছিল। শোভা একটা ঠিকা মালী লাগিয়ে জঙ্গল সাফ করিয়ে নিয়ে পছন্দমত কতকগুলো ফুলগাছ লাগিয়ে ফটকের দু'পাশ থেকে ইঁটের খাঁদরি টেনে বাগানের সীমা-রেখা টেনে দিল। বাইরের দালানে একটা গোল টেবিল আর খানকয়েক রেঙুনি বেতের চেয়ার ফেলে দিল। নিখিলেশ এখানে সপ্তাহে দু'দিন তার ইন-টেলেখচুয়েল বন্ধুবান্ধব নিয়ে মজলিস বসায়। ভিতরকার প্যাসেজে একটা গালচে ফেলে দিল। দরজায় দরজায় সামান্য কাজ করা হালকা মেরুন রঙের জাপানী সিল্কের পর্দা পড়ল। ঘরের দেয়ালে দেয়ালে বড় বড় সাহিত্যিক, শিল্পী ও দেশনেতাদের ছবি টাঙানো হল। প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়া মহাপুরুষদের ছবি ঘরে রাখার ওপর

নিখিলেশের আস্থা নেই; তবু এ গুলোয় সে আপত্তি করেনি। কিন্তু শোভা যখন চৈতন্যদেবের ভাবঘন মূর্তির একখানা বড় ছবি দেয়ালে লাগাবার ব্যবস্থা করল, নিখিলেশ হৈ-চৈ করে উঠল। বললে, না না, ওসব ছবি এখানে রাখা চলবে না শোভা। ধর্মের নামে যাঁরা নাম করেছেন, তাঁদের ছবি এ এলাকা থেকে সরিয়ে নাও। যদি রাখতে হয়, ওসব তোমার কাঁদা-কাটার ঘরে নিয়ে গিয়ে তোল।

কোণের সবচেয়ে ছোট ঘরটায় শোভা নিজের ঠাকুর-ঘর করেছিল। পূজা করবার সময় শোভা এক একদিন অস্ফুট স্বরে প্রার্থনা করত, বাইরে থেকে কান্নার মত শোনাত বলে নিখিলেশ পরিহাস করে ওই ঘরের নাম দিয়েছিল, কাঁদা-কাটার ঘর।

নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যে ওরা দিন কাটাচ্ছিল। নিখিলেশ অধ্যাপনা আর দার্শনিক গবেষণা নিয়ে, শোভা ঘর-কন্না আর পাড়া-পড়শীদের খোজ তল্লাশ নিয়ে। শোভার এক বাড়তি কাজ হয়েছিল দুঃস্থ প্রতিবেশীদের ঘরে অসুখ বিসুখ হলে তার দেখাশোনা এবং শুশ্রূষা করা। কিছুদিনের মধ্যে দক্ষ শুশ্রূষাকারিণী হিসাবে ওই চত্বরে শোভার নাম ছড়িয়ে পড়ল। করুণা, সেবা, সৌজন্য এবং সংস্কৃতির চমৎকার একটা আব হাওয়া তৈরী হল ওদের বাড়ীটিকে ঘিরে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ একরকম ছিল না বললেই হয়। সাংসারিক তত্ত্বাবধানে নিখিলেশ কোনদিন মাথা গলাতো না, তার চিন্তার এলাকায় শোভা কোনদিন অনধিকার প্রবেশ করত না। কোন বিষয়ে মতের পার্থক্য থাকলেও শোভা তা উগ্রভাবে প্রকাশ করে কোনদিন নিখিলেশকে চঞ্চল করে তুলত না। কেবল একটি

বিষয়ে ওদের গুরুতর মতভেদ ছিল। সে ওরা মেনে নিত। সে ধর্মের ব্যাপারে।

নিখিলেশের যত অবিশ্বাস, শোভা তত বিশ্বাস। শোভা শুধু ঈশ্বরে বিশ্বাস করতো না, তেত্রিশ কোটি দেবতার বড় ছোট মাঝারি যে যেখানে আছেন, কারও শোভার নমস্কার এড়িয়ে পালিয়ে যাবার জো ছিল না। এমন কি, ভূত, ভৈরব, পিশাচ প্রভৃতি দুষ্ট মহাত্মারাও যে যেখানে আছেন, সকলেই দিনান্তে শোভার কাছে একবার কপাল-ছোঁয়ানো খাজনা পেতেন। বার, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি সাংস্কারিক ধর্মাচরণ যতরকম ভাবে হয়, সে সব তো শোভার ছিলই, তার ওপর তার অদ্ভুত নিষ্ঠা ছিল। সে সত্যই বিশ্বাস করত ও সব, স্বপ্ন দেখত, সারাক্ষণ মনের একটি অংশ ঐদিকে হেলিয়ে রাখত। পুজোর ঘর থেকে এক একদিন অনেকক্ষণ পরে যখন সে বেরিয়ে আসত, ওর শরীরে মুখে এমন একটা প্রশান্ত স্থৈর্যের আভা লাগত যে, নিখিলেশ দেখে অবাক্ হয়ে যেত। বলত, তুমি বেশ শোভা, ঘণ্টা দুয়েক একলা ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাক, তোমার শরীরটি বেশ থাকে। আমিও এবার থেকে ওই রকম করবো। মাঝে মাঝে বড় অনিদ্রা হয়, আশা করি সে দোষ একেবারে নিরাময় হবে।

তার পূজা প্রভৃতিকে কেবল শারীরিকভাবে হিতকর বলায় নিখিলেশ শোভাকে পরোক্ষে কষ্টই দিত। কিন্তু শোভা কোন দিন প্রতিবাদ করত না বরং হাসিমুখে বলত, বেশ তো, করলেই তো পার।

বিয়ের পর কিছুদিন শোভা চেষ্টা করেছিল নিখিলেশকে এই পথের পথিক করতে। কিন্তু দেখল, সে ভারী কড়া সুপারি। এই বিষয়ে কথা তোলামাত্রই সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠত এবং উল্টো চেষ্টা করত শোভাকে বিশ্বাস থেকে চ্যুত করতে। শোভা

অত্যন্ত ধীর হলেও মাঝে মধ্যে কথা কাটাকাটি হত। শেষে নিখিলেশ একদিন খোলাখুলি বলে দিল যে, ধর্ম বা আনুষঙ্গিক কোন অনুষ্ঠান শোভা যেন নিজের ওই ছোট্ট ঘরের বাইরে সংসারের সাধারণ ক্ষেত্রে না এনে ফেলে। সেই থেকে শোভা আর এ বিষয়ে মাথা ঘামাতো না, নিজের ভাবেই নিজে সন্তুষ্ট থাকত।

নিজের অবিশ্বাস সম্বন্ধে নিখিলেশের এই শুচিবাইকে শোভা অনেক যত্নে অনেক সাবধানে বাঁচিয়ে চলত। ধর্ম সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ তো সে তার সামনে তুলতোই না, কোন দেব-দেবী বা ধর্মপ্রচারকের ছবি অবধি সে পুজোর ঘরের বাইরে রাখতো না। এমন কি কোন ধর্মের বই অবধি না। সে নিশ্চয়ই জানত, তেমন কিছু দেখলেই নিখিলেশ ক্ষেপে যাবে। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা একসঙ্গে শোয়া বসা করে একটা গুরুতর বিষয়কে চিরকাল কিছু এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়।

একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে দর্শন শাস্ত্রের পণ্ডিতদের সভায় যোগ দিতে নিখিলেশ দিল্লী গেল। কথা ছিল দিন দশেক পরে আসবে। দুতিন দিন পরে শোভার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল। স্বামীর একগুঁয়ে অবিশ্বাসের জন্য সে ঠাকুর দেবতার কাছে নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে করত এবং অনুক্ষণ প্রার্থনা করত তাঁরা যেন এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ গ্রহণ না করেন। এইবার মনে করল, নিখিলেশ যখন বাড়ীতে নেই, তখন এই সুযোগে খুব ঘটা করে পুজো করে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়ে সে সব পাপ স্খালন করে নেবে।

নিখিলেশের ফিরতে তখনও সাত আট দিন আছে। শোভা আর দেরী করল না। সুরেশকে খবর পাঠিয়ে ডেকে এনে তাকেই সহায় ধরল। সুরেশ একবার নিষেধ করল। বললে, কাজ নেই। নিখিলেশ এলে হয়তো খুব রাগ করবে। কিন্তু শোভা শুনল না, বললে, যাঁদের পুজো করছি, তাঁরাই আমায় বাঁচিয়ে দেবেন।

পুরোহিত ডাকা হল। দিন তিনেক পরে শুভদিন ছিল। সেই-দিনই আয়োজনের ব্যবস্থা হল। খুব হৈ-রৈ হল। পূজা, ব্রাহ্মণ-ভোজন, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি এই রকম একটা ব্যাপারে যা কিছু হওয়া সম্ভব, শোভা মনের খেদ মিটিয়ে করে নিল। সমস্ত চুকতে বেলা গড়িয়ে গেল সন্ধ্যায়। একটু রাত্রি হলে সুরেশ ফিরে গেল। শোভার ইচ্ছা ছিল, সেই দিনই জিনিসপত্র যথাস্থানে রেখে ঘোর দোর গোছগাছ করে ফেলবে, কিন্তু হয়ে উঠলো না। পরিক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পূজার উপকরণ বাড়ীময় ছড়ানো রইল—এখানে কোশাকুশি, ওখানে ভোগের থালা, সেখানে কোন ঠাকুরের ছবি, আর এক জায়গায় পঞ্চপ্রদীপ, এইভাবে।

পরের দিন শোভার ঘুমই ভাঙ্গল একটু বেলায়। স্নান সেরে কাজে হাত দিতে যাবে এমন সময় বাইরে ডাকাডাকি শুনতে পেল।

নিখিলেশ সভার কাজ শেষ হবার পর আর মোটেই কোথাও ঘোরাঘুরি করেনি, সরাসরি বাড়ী চলে এসেছে। ফটক থেকেই সে শোভার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে বাড়ী ঢুকলে।

আকস্মিক আনন্দে শোভা রোমাঞ্চিত হল। তারপরেই ভয়ে কুঁকড়ে গেল। কি সর্বনাশ! নিখিলেশ এ সমস্ত দেখলে কি বলবে।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল বারান্দায়। একলাফে দালানে উঠে একহাত দিয়ে সে শোভাকে জড়িয়ে ধরলে। সদ্য ট্রেণ-যাত্রার পরও স্যুট-পরা নিখিলেশকে ভারি তাজা দেখাচ্ছিল। শোভার কাছে ফিরে আসার আনন্দ ট্রেণযাত্রার ক্লান্তিকে তার শরীরের ওপর ছাপ ফেলতে দেয়নি।

নিখিলেশ ঘরের দিকে এগুতে যাচ্ছিল। শোভা তার হাত চেপে ধরল। বললে, এখন যেও না, তুমি একটু দালানে বস, আমি ঘরটা গুছিয়ে দিই।

নিখিলেশ হেসে উঠল। বললে, তাহলে আর দালানে বসে কি হবে? একেবারে থানায় গিয়ে ডায়েরী করে আসি যে, আমার স্ত্রী আজ ঘর গুছিয়ে রাখেনি।

বলে ঘরের দিকে আবার গতি নিল। শোভা আবার তার হাত চেপে ধরল। বললে, কথা রাখ। তুমি দশ মিনিট বস। আমি বললে তারপর ভিতরে যেও।

স্ত্রীর কণ্ঠস্বর নিখিলেশকে আশ্চর্য করল। উদ্বেগে শোভার কপাল বিন্দু বিন্দু ঘেমে উঠেছে আর তার চোখে আর্তির ছায়া। নিখিলেশ বললে, কি ব্যাপার বল তো। ঘর অগোছালো তো কি হয়েছে? নিশ্চয়ই কিছু একটা অঘটন ঘটেছে, তুমি আমাকে লুকোচ্ছ। তা হবে না।

তার হাত ছাড়িয়ে নিখিলেশ এগিয়ে গেল। শোভা অনুসরণ করল।

প্যাসেজটার মাঝখানেই শোভার ঘরের দরজা। পর্দা সরিয়ে ঘরের মধ্যে পা দিতেই নজরে পড়ল মেঝেয় থৈ থৈ করছে পূজাবশেষ উপকরণ। একমুহূর্ত নিখিলেশ অশেষ বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ালো। এদিককার ঘরে পূজা বা ধর্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠানের কোন চিহ্ন আনতেও সে শোভাকে বার বার নিষেধ করেছে, তা সত্ত্বেও শোভা নিষেধ মানেনি। দাম্পত্য জীবনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে সে নিখিলেশের এই একটিমাত্র অনুরোধের মর্যাদা দেয়নি। কথাটা যেন তার মন প্রথমটায় ভাল করে গ্রহণ করতেই পারল না। কয়েক মুহূর্ত সে একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। শোভার দিকে মাঝে মাঝে তাকাতে লাগল আর মনে প্রাণপণ চেষ্টা করল ঘটনার প্রতিক্রিয়া যেন তার দখলে থাকে। কিন্তু সম্ভব হল না। একটা জ্বালার আবর্ত তৈরী হল ভিতরে, মাথায় রক্ত চড়ে গেল।

বললে, এ কি করেছ ?

শোভা পাংশুমুখে দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বেরুলো না।

কেমন একটা ব্যাকুল মুখভঙ্গী করে নিখিলেশ চীৎকার করে উঠল, এ কি করেছ ?

শোভা অস্ফুট-স্বরে বললে, পুজো।

—পুজো! পুজো কি? যেন 'পুজো' শব্দের আভিধানিক অর্থটুকুও নিখিলেশের জানা নেই।

নিরুত্তর শোভার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে ক্ষ্যাপার মত নিখিলেশ কেবল ওই একই প্রশ্নের পুনরুক্তি করতে লাগল, পুজো কি ? বল, পুজো কি ?

তারপর এই নিরন্তর প্রশ্নের একসময় ইতি করে নিখিলেশ, এককোণে একটা গঙ্গাজলের ঘটি ছিল, সেটাকে এক লাথি মেরে উঠানের দিকে ফেলে দিল। আর একদিকে কোশাকুশি আর শাঁখ পড়েছিল, সেগুলো হাতে করে তুলে নিয়ে জানালা দিয়ে বাড়ীর অদূরে পগার লক্ষ্য করে ছুঁড়ে ফেলল। বেলফুলের কয়েকটা বড় বড় সুন্দর মালা আগের দিন শোভা নিজের হাতে গেঁথেছিল। কতক ইতস্ততঃ ছড়ানো ছিল। সেগুলো এলোমেলো কুড়িয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে জুতোর তলায় ফেলে ঘষে ঘষে নিস্পিষ্ট করল। দেয়ালে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধর মূর্তির একখানা বড় ছবি টাঙিয়েছিল শোভা। ছবিতে মালা ঝুলছিল। মালা ছিঁড়ে টানাটানি করে ছবি পেরেক থেকে খুলে সেটাকে শুদ্ধ বাইরে ফেলতে গেল।

শোভা আর থাকতে পারল না। তাড়াতাড়ি নিখিলেশের হাত থেকে ছবিটা ছিনিয়ে নিতে গেল। আর্তস্বরে বললে, ওটা ফেল না, ফেল না। আমি এখনই সরিয়ে রাখছি।

—সরে যাও—এক ঝটকায় নিখিলেশ শোভাকে ঠেলে ফেলে দিল। জানালার গরাদেতে লেগে শোভা মাথায় আঘাত পেল। সে আর নিখিলেশকে বাধা দেবার চেষ্টা করল না। গরাদে ধরে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

ছবিটাকে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে নিখিলেশ নিজের উত্তেজনা সামলাতে সেই অবস্থাতেই বাইরে বেরিয়ে গেল।

সমস্ত দিন নিখিলেশ পথে পথে ঘুরল, হোটেলে খেল, ছ'একজন বন্ধুর বাড়ী গিয়ে অকারণ বাক্যালাপ করে সময় কাটাল, তারপর দিনের শেষে নিজেকে কতকটা শান্ত বোধ করল। একটু অনুতপ্তও হল। শোভা তো তাকে ইচ্ছা করে অপমান করেনি। তার ওপর অতখানি কঠোর সে না হলেও পারত। ঘরে একটু পুজো হয়েছে বলে অবিশ্বাসের ওপর তার নিষ্ঠা চলে যাবে, এত দুর্বল তো সে নয়।

অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে নিখিলেশ আহার শেষ করে ওঠার পর ওরা যখন শুল, কিছুক্ষণ অবধি ওদের মধ্যে একটা নিষ্ঠুর থমথমে স্তব্ধতা অনড় হয়ে রইল। শেষে নিখিলেশ সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে বললে, এ তুমি কেন করলে শোভা? আমি তোমাকে বিশ্বাসের স্বাধীনতা দিয়েছি, তুমি আমাকে অবিশ্বাসের স্বাধীনতা দেবে না?

ঘরের আলো নেভানো ছিল। শোভার কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে অন্ধকারের মধ্যে তার মুখের ওপর হাত রেখে নিখিলেশ অনুভব করল, শোভার চোখে জল। সে ক্লিষ্ট বোধ করল। খোলা জানালার বাইরে দিয়ে অনেকখানি আকাশ দেখা যাচ্ছে। শুক্লপক্ষের মাঝামাঝি কোন একটা তিথি হবে। ফিকে সাদা রঙের টুকরো টুকরো মেঘ বেগে উত্তরের দিকে ভেসে যাচ্ছে।

সপ্তর্ষির চিরন্তন প্রশ্ন-চিহ্নের খানিকটা দেখা যাচ্ছে, খানিকটা দৃষ্টির গণ্ডীর বাইরে পড়েছে। একটা জটা-জটিল বিরাট বটগাছ ধ্যানস্থ ঋষির মত নিষ্কম্প ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। সহরতলির রাত্রির বুক থেকে একটা মিশ্র ঝিমঝিম ধ্বনি উঠছে। আর সমস্ত কিছুর উপর যেন কোন অদৃশ্য যাদুকর ছায়ায় বোনা একটা রহস্যের চাদর ছড়িয়ে দিয়েছে। নিখিলেশের মনে হল, এ সব কিছুই কিছু নয়। এ বিশ্বাসেরও কোন মানে নেই, অবিশ্বাসেরও কোন মানে নেই। আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধিপ্রধান জীবন যাপনের চেষ্টারই বুঝি কোন অর্থ নেই। মানুষ হৃদয় দিয়ে চেষ্টা করলে আর কিছু না হোক অন্তত মানুষকে বুঝতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে চেষ্টা করলে কেবল পদে পদে নির্বোধ বনাই তার ভাগ্যে থাকে। না হলে, যে শোভাকে সমস্ত মন দিয়ে সে এতখানি ভালবাসে, কেবল গোঁড়ামির বশে আজ তাকে এতখানি কষ্ট সে কেন দিল।

শোভার চুলে আঙুল বুলোতে বুলোতে নিখিলেশ স্নিগ্ধস্বরে বললে, তুমি অনেক কিছু বিশ্বাস কর শোভা, আমি কিছুই বিশ্বাস করি না। হয়তো তোমার বিশ্বাস আর আমার অবিশ্বাস দুটোই সমান মিথ্যা। কিন্তু আমাদের ভালবাসা তো মস্ত সত্য। ওর মধ্যে একটুখানিও খিঁচ এসে পড়ে এমন কিছুই তুমি কোর না। তাহলে সংসারে বেঁচে থাকবার কোন কারণই আর আমি খুঁজে পাব না।

শোভা কোন কথাই বললে না। কেবল তার চোখের জলের বেগ কিছুক্ষণ অবধি বেড়ে গেল। যে ঘটনা তার মনকে দোলা দেয়, তার ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়াকে মনের বাইরে আসতে দেওয়া তার স্বভাব নয়। আজ আঘাত অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এসেছিল বলেই তার চোখে জল।

একটু শান্ত হতে সে উঠে বসল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে হঠাৎ নিখিলেশের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে শোভা গভীর স্বরে বললে, দেখ, তুমি বললে আমার বিশ্বাস মিথ্যে। মিথ্যে নয়। আমি জানি ওঁরা আছেন। তুমি জানো না তাই মানো না। কিন্তু যদি কখনও খুব বিপদে পড়, এমন বিপদ যে কোনদিকে আর কুল দেখা যায় না, কোন মানুষের ওপর নির্ভর করা যায় না, তখন তুমি ওঁদের আকুল হয়ে ডেকো, দেখবে ওঁরা আসবেন, এসে তোমাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। এ মিথ্যে নয়, এ কিছুতেই মিথ্যে নয়।

শোভার বলার ভঙ্গী আর কণ্ঠস্বরের অদ্ভুত আন্তরিকতায় নিখিলেশ আশ্চর্য হল। কে জানে শোভা কি পেয়েছে! কেবল সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু কেমন নিশ্চিন্ত, নির্দ্বন্দ্ব ওর মন এই বিশ্বাসের বলে!

শোভার সম্বন্ধে একটা সস্নেহ কৌতুকের ভাব নিয়ে নিখিলেশ সে রাত্রির মত ঘুমিয়ে পড়ল।

আপনারা অধীর হবেন না। গল্প বলতে বলতে রাত যে পুইয়েছে, সে খবর আমিও পেয়েছি। পূবের আকাশে কালো মেঘের ধারে ধারে অরুণোদয়ের রাঙা ছটা আমিও একসময় বাইরে চোখ ছড়িয়ে দেখে নিয়েছি। কিন্তু বেনারস আসতে এখনও যেটুকু সময় লাগবে, তার মধ্যে আমার বাকী অংশটাও নিশ্চয়ই সেরে নিতে পারব।

সেই একটা দিন ছাড়া ওদের দাম্পত্য জীবনে ছন্দপতনের উদাহরণ আর বড় মেলে না। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর

সাগরের ঢেউয়ের মত পর পর গড়িয়ে যেতে লাগল। অনেকদিন বিধিবদ্ধ জীবন যাপনের ফলে নিখিলেশের বুদ্ধিপ্রধান সত্তাকে অপরিবর্তিত রেখেও তার মধ্যে একটা শান্ত ধীরতা নেমে এল। শোভার সঙ্গে সুসমঞ্জস জড় সম্পর্কের ফলে সৃষ্টির যে আনন্দময় মাধুর্যময় সম্ভাবনার আভাষ সে পেয়েছিল, তার তার্কিক মন তাকে তখনও স্বীকার করে নিলে না। বাঁচার মধ্যে যে একটা প্রণালী মেনে নিয়েছে, সে কেবল শোভার খাতিরে, নিখিলেশ এই কথাই যেন মনকে বোঝালে।

অনেকদিন পর শোভার সন্তান-সম্ভাবনা হল। নিজের যত্নে সাজানো ফুলবাগানটির মত পরিপূর্ণতার একটা আশ্চর্য রূপ শোভাকে আশ্রয় করল। নিখিলেশ ভিতরে ভিতরে একটা অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ অনুভব করল। স্ত্রীপুত্র নিয়ে সকল দিক থেকে সাদাসিধে সংসারী মানুষের মত তৃপ্ত সাধারণ জীবন যাপন করছে, বুদ্ধির স্তরে সে এই খেদকে অনুশীলন করতে চেষ্টা করল কিন্তু ভিতরে ভিতরে গূঢ়তম সত্তায় সৃষ্টির ধারা ঠিক ঠিক বজায় থাকলে মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতার অনুভূতি হয়, সেই অনুভূতির ত্রস্ত আনন্দ তাকে দুলিয়ে দিল।

তারপর, অদৃষ্টের যে এক একটা ঝড় মানুষের জীবনের সমস্ত ব্যবস্থাকে উল্টে-পাল্টে একেবারে তচনচ করে দেয়, নিখিলেশের জীবনে তেমনই একটা ঝড় উঠলো।

একদিন শীতের রাত্রে ওরা থিয়েটার দেখে ফিরলো। নিখিলেশের একজন সাহিত্যিক বন্ধুর লেখা নাটকের শৌখীন অভিনয়। শুরু হবার কথা ছিল ছ'টায়, শুরু হল রাত্রি আটটায়। ফিরতে বারটা বেজে গেল।

বাড়ী পৌঁছে নিখিলেশ বললে, তোমার নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লেগেছে শোভা, তুমি যে রকম হাঁচ্ছো।

শোভা বললে, তাই হবে। আজ আর কিছু খাব না। বেলাবেলি বেরুলাম, গায়ে জড়াবার মত কিছু নেবার ইচ্ছে হল না। এখন দেখছি, নিলেই ভাল হত।

ওর একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স ছিল। দুঃস্থ প্রতিবেশীদের অসুখ-বিসুখ হলে সেটা বিশেষ কাজে লাগত। একটা শিশি থেকে চার-ছটা গ্লোবিউল বার করে শোভা মুখে ফেলে দিল।

দিন দুই তিন স্বাবলম্বী চিকিৎসা চলার পর একদিন শোভা আর উঠতে পারল না। তার থমথমে মুখ আর ছলছলে চোখ দেখে নিখিলেশ তাপ বোঝার জন্য কপালে হাত দিয়েই চমকে উঠল। বিমূঢ় স্বরে বললে, তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে, কি করা যাবে?

শোভার জোরে কথা বলারও শক্তি ছিল না। জ্যোতিহীন চোখে নিখিলেশের দিকে চেয়ে অস্ফুট স্বরে বললে, আমার মাথায় কিছু আসছে না। যা ভাল বোঝ, কর।

নিখিলেশ কিছুই বোঝে না। কোনরকম ব্যবহারিক বিষয়েই তার পটুত্ব নেই। সে সোজা গিয়ে সুরেশকে খবর দিল। সুরেশ এসে টেম্পারেচার নিয়ে দেখল, তাপ ১০৩°।

ওদের পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার চ্যাটার্জিকে কল দেওয়া হল। বুকে পিঠে নল বসিয়ে বহুক্ষণ পরীক্ষা করে ভদ্রলোক অসাধারণ গম্ভীর মুখে প্রেসক্রিপসন লিখলেন।

সুরেশ জিজ্ঞাসা করল, কি রকম বুঝলেন?

ডাক্তার বললেন, খুব ভাল বুঝছি বলতে পারিনে। মনে হচ্ছে, দুটো ফুসফুসেই নিউমোনিয়া হয়েছে। একটু প্লুরিসির ভাবও রয়েছে।

ডাক্তার চলে গেলে সুরেশ ওষুধপত্র কেনাবার ব্যবস্থা করে উঠে পড়ল। দালানে এসে নিখিলেশ সুরেশের হাত চেপে ধরল; বললে,

এই কটা দিন তুমি এখানে এসে থাক, সুরেশ। আমি একলা এর কিছুই করতে পারব না। তোমার ওপর শোভাকে বাঁচাবার ভার।

সুরেশ আশ্বাস দিল, থাকতেও অরাজী হল না।

প্রথম দিকে একবার একটু ভালর দিকে গিয়েই অসুখটা একেবারে বেঁকে দাঁড়ালো। প্রলাপ সুরু হল। প্রলাপে সমস্ত কথা-বার্তাই পেটের সন্তানের জন্য উদ্বেগ-সূচক। চিকিৎসা, যত্ন এবং শুশ্রূষা—সুরেশ কিছুরই কিছু ত্রুটি করল না। রাত্রে নিজে তো রোগীর কাছে থাকতই, একজন নার্সও রেখে ছিল। কিন্তু অসুখ সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা অবজ্ঞা করে নিজের একগুঁয়ে গতি নিয়ে কেবল মন্দের দিকেই এগুতে লাগল।

সেবা-শুশ্রূষার ব্যাপারে নিখিলেশ কোন সাহায্যই করতে পারত না। একে এমনিতেই সে এসব ব্যাপারে একান্ত অপটু, তার ওপর শোভার ঘরে সে বেশীক্ষণ থাকতেও পারত না। বিয়ে হওয়ার পর সে শোভাকে কখনও অসুস্থ হতে দেখেনি। তেলভরা প্রদীপের পুষ্ট শিখার মত শোভার শ্যামল শরীর স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে সারাক্ষণ উজ্জ্বল থাকত। এখন সে মাঘশেষে গাছের পাতার মত শীর্ণ বিবর্ণ হয়ে গেছে। চোখ বুঁজে নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে চাদর-ঢাকা কঙ্কালের মত। আর মাঝে মাঝে পা থেকে মাথা অবধি সারা শরীরে চমক খেয়ে হঠাৎ চোখ মেলে। বড় বড় চোখের আয়ত দৃষ্টিতে শূন্যের দিকে চেয়ে আপন মনে কি বকে।

সুরেশ নিখিলেশকে শোভার ঘরে শুতে দিত না। তার শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল বসবার ঘরে। রাত্রে নিখিলেশ ঘুমুতে পারত না। পাশের ঘরে সামান্য শব্দ হলেই ধড়মড় করে উঠে পড়ত। তার আশঙ্কা হত, শোভার শ্বাস উঠল, শোভা বুঝি মৃত্যুভয়ে চীৎকার করে উঠল। রোগীর ঘরে গিয়ে খবর নেবার সাহস হত না। অধীর

আতঙ্কে কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থাকত। তারপর শব্দের জের মিলিয়ে গেলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হত।

কখনও কখনও মধ্যরাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ফুলবাগানের মধ্যে বসত। শোভার হাতে-বোনা আসন লাগানো একটা বড় বেতের চেয়ার ছিল। সচরাচর সেটাকে সকালে বের করে বাগানে রাখা হত, আবার রাত্রে ভিতরে তোলা হত। শোভা অসুস্থ হওয়াতে এদিকে আর কেউ দেখে না। বেতের চেয়ার দিনরাত্রি বাগানেই পড়ে থাকে। নিখিলেশ এই চেয়ারে বসে ক্লান্ত উদ্দেশ্যহীন বিনিদ্র দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে থাকে। ম্লান জ্যোৎস্নায় সমস্ত ফুল, চারিদিকের গাছপালা অদ্ভুত একরঙা বলে মনে হয়। গেটের বাইরে ছোট ছোট পাতায় ভর একটা বিশাল শিশুগাছ ওই জ্যোৎস্নায় রঙ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। অদ্ভুত স্তব্ধ, কিন্তু অদ্ভুত জীবন্ত দেখায়। আরও দূর, অনেক দূর অবধি সমস্তই যেন সেই অদ্ভুত একরঙা আর অদ্ভুত জীবন্ত মনে হয়। যেন আকাশ থেকে একটা ম্লান হাসি ময়লা রূপার রঙ ধরে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। ছেলে-মানুষের মত নিখিলেশ এই স্তব্ধ জীবন্ত প্রকৃতির উদ্দেশ্যে নিজের উদ্বিগ্ন মনের প্রশ্ন নিক্ষেপ করে; শোভা কি বাঁচবে? শোভা কি বাঁচবে? ফুলবাগান, শিশুগাছ, নক্ষত্র, আকাশ—কোথাও থেকে কোন জবাব আসে না। চাঁদের আলো ক্রমশ ম্লান হয়ে সমস্ত কালোয় লেপা-জোপা হয়ে যায়। সহরতলির প্রান্তের জঙ্গল থেকে শিয়ালের ডাক ওঠে। একটা অনির্দিষ্ট ভয়ে নিখিলেশ শিউরে ওঠে। তারপর আবার ঘরে ফিরে আসে।

শুক্লা একাদশীর সকাল থেকে অবস্থা আরও মন্দের দিকে নামলো। ঠিকমত শ্বাস নিতে না পারায় অবর্ণনীয় কষ্টের ছাপ ফুটে উঠলো শোভার মুখে। হাওয়া নেবার চেষ্টায় ঠোঁট দুটো

অনেকখানি ফাঁক হয়ে গেল আর টানা টানা শ্বাসের তালে তার নাসারন্ধ্র অস্বাভাবিক বড় হয়ে আবার কুঞ্চিত হতে লাগলো। ফুসফুস থেকে বাঁশিতে ফুঁ দেওয়ার শব্দের পরিবর্তে একটা ভীতি-জনক উচ্চ ঘড় ঘড় ধ্বনি উঠতে লাগলো।

সহরের একজন শ্রেষ্ঠ ডাক্তারকে ডাকা হল। প্রচণ্ড রকমের সবল, সুস্থ, মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। অনেক মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ের ফলে মুখখানা শ্মশানের মত গম্ভীর। ভদ্রলোক ওষুধ সামান্যই পালটালেন, তেমন কিছু আশা দিলেন না এবং অক্সিজেনের ব্যবস্থা দিয়ে চলে গেলেন।

বিরাট এক যন্ত্র এনে রোগীর বিছানার পাশে রাখা হল। শত্রু যদি স্বয়ং যমরাজ না হয়ে আর কেউ হত, তাহলে বোধ হয় কেবল যন্ত্রের চেহারা দেখেই রোগীকে ফেলে পিছু হাঁটত। চার হাত নলের আগাটা শোভার নাকে লাগিয়ে দেওয়া হল। অল্পক্ষণ পরে বাহ্যিক কষ্টের চিহ্ন অনেক কমে এল। মৃত্যুর মত একটা স্পন্দহীন শান্তি নামল শোভার শরীরে।

নিখিলেশ যেন নিয়তির পায়েদলা কীটের মত নিস্পিষ্ট হয়ে গেল। এতদিন একটা আশার দুর্বল শিখা সংশয়ের ছাই চাপা হয়ে চিত্তের তলায় ধিকধিক করে জ্বলছিল। একটা নাছোড়বান্দা বিশ্বাস: শোভা বাঁচবেই। সেইটুকুও আর রইলো না। ওই যন্ত্রটা জীবিতলোকের কেউ নয়, মৃত্যু-লোকের দূত। ওর হাতে যমরাজের সেই পাকা নোটিশ, যার আর প্রত্যাহার নেই।

অক্সিজেন দেওয়া শুরু হওয়ার পর থেকে নিখিলেশ আর শোভার ঘরে গেল না। কোথাও বেরুলোও না। অনড় স্থবির মানুষের মত নিজের বিছানায় সারাদিন চুপচাপ বসে রইল। চিন্তা-

শক্তির উন্মেষ থেকে সৃষ্টিতত্ত্বের ধাঁধা নিয়ে সে কতই না যুক্তিতর্ক করেছে, কত চরম সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে, কিন্তু আজ নিজের সত্তার একমাত্র অবলম্বন সরে যাওয়ার সামনে সে সমস্তই নিতান্ত মিথ্যা, ফাঁপা পাণ্ডিত্য ছাড়া আর কিছুই তার মনে হল না। শোভার অসুখ কঠিনতর হওয়ায় বিপদ যতই ঘনিয়ে উঠছিল, ততই তার মনে একটা অদ্ভুত বিস্ময় ক্রমশ সঞ্চিত হয়ে একেবারে পর্বতপ্রমাণ হয়ে দাঁড়ালো। কি আশ্চর্য! এই সৌর-জগৎ, এই ব্রহ্মাণ্ড, এই সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র, এই দিগন্ত-বিস্তৃত প্রকৃতি, এত প্রাণ, এত চৈতন্য— এর কোনখানে এমন কোন শক্তি নেই যা শোভাকে আয়ু ফিরিয়ে দিতে পারে! ঘরের দেওয়ালে আসবাবে, বাহিরের গাছে আকাশে, নিখিলেশ বারবার উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো যেন এখনই ওইগুলির মধ্যে কোনখানে সে বিরাট একটা অলৌকিক শক্তির সন্ধান পেয়ে যাবে, যার কল্যাণকর প্রভাবে সে আবার শোভাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবে।

গভীর রাত্রে সুরেশ নিখিলেশের দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিল! নিখিলেশ চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিতে সুরেশ বললে, শোভা তোমাকে দেখতে চাইছে, একবার চল।

নিখিলেশের মনে হল বুঝি শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে। এক মুহূর্ত চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে সে প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে নিজের মধ্যে একটা স্থৈর্য আনল। তারপর সুরেশের সঙ্গে ধীরভাবে শোভার ঘরে গেল।

অবস্থা যে আরও কিছু খারাপ হয়েছিল, তা নয়। সেই অসুস্থতার মধ্যেও শোভা যেন কিছুক্ষণের জন্য স্বাভাবিক চেতনা ফিরে পেয়েছিল। নাকে লাগানো নল দেখে সে অনুমান করল এই জগৎ

থেকে বিদায় নেবার সময় বুঝি তার আসন্ন হয়েছে। সে এ চায়নি। চায়নি নিখিলেশের জন্য, চায়নি তাদের অনাগত সন্তানের জন্য। এই নির্বন্ধের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদের কথা তার মনে উঠলো না, তবু এর জন্য সে প্রস্তুতও ছিল না।

নিখিলেশ পাশে এসে দাঁড়ালো। শোভার হাত তুলবার মত শক্তি ছিল না, কেবল আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিল। নিখিলেশ দুই করতলের মধ্যে শোভার হাতটা তুলে নিল। রোগীর ঘরের ঢিমা আলোয় সে দেখতে পেল না, শোভার দুই চোখের কোণ দিয়ে কেবলই জল পড়ছে। কিন্তু তার নিজের আশঙ্কা হল, সে আবেগ রুদ্ধ করতে না পারলে হয়তো এখনই শোভাকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেলবে।

কতক্ষণ পরে নিখিলেশ হঠাৎ শোভার হাতটা ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার সংযমের শক্তি ফুরিয়ে এসেছিল। নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে সে মার-খাওয়া বালকের মত কান্নায় ফেটে পড়ল।

অন্ধকার ঘরে সেই উচ্ছ্বসিত বুকফাটা কান্নার মধ্যে নিখিলেশ যেন স্থান কালের চেতনা হারিয়ে ফেলল। এ কান্না যেন কেবল আজকের জন্য নয়, কেবল শোভার জন্য নয়। যুগ-যুগের আর্ত মানুষের অশ্রুজল যেন নিখিলেশের বুকে বিন্দু বিন্দু করে সঞ্চিত হয়েছিল। গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার প্রতিটি দিন যেন চরম ব্যর্থতার মধ্যে নিঃশেষ হয়ে এক এক অঞ্জলি অশ্রু-জলের দান রেখে গেছে। সে যেন জানত, একটা গূঢ় রহস্যময় চেতনা প্রতিদিনই অশ্রুজলের এই দৈনিক সঞ্চয়ের খবর যেন তার কাছে পৌঁছে দিত। কিন্তু তবু সে কাঁদেনি। একটা নির্বোধ শীতল অহমিকায় এই অশ্রু জমাট হয়েছিল। আজ আত্মার এই চরম সঙ্কটের

সময় সে অহমিকা ভাঙ্গা কাঁচের মত চূর্ণ হয়ে গেছে। আজন্ম সঞ্চিত অশ্রু বাঁধভাঙা বন্যার মত তাই আজ বেরিয়ে এসেছে।

শৈশব থেকে আজকের দিন অবধি গোটা জীবনটা নিখিলেশের চোখের সামনে চলচ্চিত্রের ছবির মত ভেসে উঠলো। মনে পড়লো সেই জ্যাঠামশায়ের কথা, যাঁর দক্ষিণ ভ্রূর ওপর বীভৎস ক্ষত চিহ্ন ছিল। তাকে পীড়ন করে কি নিষ্ঠুর আনন্দই না তিনি পেতেন। মনে পড়ল তার উদার চরিত্র পিতার কথা যাঁর ছায়ায় বসে সে মনকে অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল। মনে পড়ল তার তীব্র জ্ঞানপিপাসার কথা, যার ফলে সে সিদ্ধান্ত করেছিল, এই নশ্বর আদর্শহীন সৃষ্টির পূর্বেও কিছু ছিল না, পরেও কিছু ছিল না। কি মূঢ় আত্মপ্রসাদে সে নিজেকে সর্বজ্ঞ জেনে বসেছিল! যে বুদ্ধি দিয়ে মনে মনে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে বোঝা যায় না সেই বুদ্ধির পরামর্শে সে বিশ্ব-প্রপঞ্চকেই না-মঞ্জুর করে বসেছিল। তারপর মনে পড়ল শোভার কথা, যে তাকে বদলে দিল, যার নিষ্কম্প দীপশিখার মত অপ্রমত্ত চরিত্রের সংস্পর্শে এসে সে শরীরের অতীত একটা আনন্দের আভাস পেল। এ কি হতে পারে যে, শোভা থাকবে না, সৃষ্টির কোনখানে নয়, ধূলিতে নয়, উদ্ভিদে নয়, আকাশে নয়, বাতাসে নয়, স্থূলে নয়, সূক্ষ্মে নয়।

তারপর সেই দিনটির কথা মনে পড়ল, যেদিন তাদের দাম্পত্য-জীবনে ছন্দপতন ঘটেছিল। ক্ষুব্ধ অপমানিত শোভার কণ্ঠস্বরে সে রাত্রে আন্তরিকতার কি আশ্চর্য ঝঙ্কার ছিল। 'তুমি মানো আর না মানো, ওঁরা আছেন। যদি কোন দিন এমন বিপদে পড় যে, কোন-দিকে আর কূল দেখা যায় না, কোন মানুষের ওপর নির্ভর করা যায় না, ব্যাকুল হয়ে ওঁদের ডেকো। ওঁরা আসবেন, এসে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। এ মিথ্যা নয়, এ কিছুতেই মিথ্যা নয়।'

মিথ্যা নয়! নিখিলেশ যেন তিমিরের মধ্যে একটা অস্পষ্ট আলোকশিখার আভাস দেখল। সেই দিন তো তার এসেছে, আজ তো আর কোনদিকেই কূল দেখা যায় না। যে অবিশ্বাস তার শির-দাঁড়াকে এতদিন সিধে রেখেছিল, সেই অবিশ্বাসে সংশয় এসেছে; যে শোভা জীবনে মাধুর্যের ইঙ্গিত এনে দিয়েছিল, সে আজ মুমূর্ষু; যে বুদ্ধি তাকে গুরুর মত সকল সঙ্কট পথের সন্ধান দিয়েছিল, সেই বুদ্ধির ওপর সে শ্রদ্ধাহীন। আজ কোন্ তরীর ওপর নির্ভর করে সে জীবন-সমুদ্র পার হবে!

ওঁরা আছেন! ওঁরা কারা, নিখিলেশ তা জানে না। কিন্তু স্থূলের অতীত যদি কোন শক্তি থাকে আজ তাঁর কাছে আবেদন জানাতে তার লজ্জা নেই। মৃত্যুর দূত শোভার ঘরের দ্বারে উঁকি-ঝুঁকি মারছে, পরাজিত বুদ্ধি তাকে তৃণের মত হীন করে দিয়েছে; অহমিকা ধূলিতে মিশেছে; যিনি আছেন কি নেই সে নিশ্চয় জানে না, তাঁর কাছেও আবেদন জানাতে আজ সে ক্ষুদ্র বোধ করবে না, বুদ্ধির মানা সে আর মানবে না।

সংকল্প স্থির হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর্ত অশ্রুসিক্ত নিখিলেশের চিত্ত থেকে প্রার্থনার ধূয়া উঠলো, বাঁচিয়ে দাও, বাঁচিয়ে দাও, শোভাকে বাঁচিয়ে দাও, সৃষ্টির অসীম শক্তিপুঞ্জের উৎসস্বরূপ যদি কোন অসীম শক্তির আধার থাক, বাঁচিয়ে দাও, বাঁচিয়ে দাও, শোভাকে বাঁচিয়ে দাও।

সমস্ত ভার সমস্ত উদ্বেগ লঘু হয়ে তরল হয়ে অশ্রুরূপে বেরিয়ে আসতে লাগল। এই প্রার্থনার যে ফল হবে, এমন কোন আশা নিশ্চয় তার ছিল না। তুফানের মধ্যে নৌকাডুবির পর লোকে যেমন ভাসমান একগাছা সরু লাঠিকেও সাগ্রহে আঁকড়ে ধরে, সেও ঠিক তেমনি করেই এই প্রার্থনা শুরু করল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই

এইতেই তার সমস্ত মন গুটিয়ে এল। অল্পক্ষণের মধ্যে সে যেন একটা নেশায় আবিষ্ট হল। পারিপার্শ্বিকের চেতনা লোপ পেল। দালানের দেয়ালঘড়ির টিক টিক শব্দ অথবা রাত্রির ঝিম ঝিম ধ্বনি কিছুই আর তার কানে এল না। অতীত ঘটনার সুখদুঃখের স্মৃতিগুলো যেমন হঠাৎ মিছিলের মত মনের মধ্যে এসে পড়েছিল, তেমনি হঠাৎ আবার সরে গেল। শয়ান শরীরের প্রসারিত দু'হাতের মধ্যে চাপাপড়া কান দুটোয় কেবল নাড়ীর আনাগোনার ধুকধুক শব্দ খুব প্রধান হয়ে বাজতে লাগল, আর সেই তালে তালে তাঁর নেশাবিষ্ট মনের আকুল আবৃত্তি উঠতে লাগলো, বাঁচিয়ে দাও, বাঁচিয়ে দাও, শোভাকে বাঁচিয়ে দাও।

খুব তাড়াতাড়ি অনেকটা সময় কেটে গেল। আকাশে কয়েকটা মেঘ এসে চাঁদের আলো ঢেকে দেওয়াতে বাইরে ঘনান্ধকার নামল। নিখিলেশের মনের সংশয় দুর্বল হয়ে মনের তলায় গুটিয়ে গেল। এই প্রার্থনার শুরুতে তার যে সংশয় ছিল, নিতান্ত গতিহীন হয়ে একটা অবাস্তব বস্তুকেই সে পথ বলে গ্রহণ করেছে, সে সংশয় সরে গিয়ে একটা নিরপেক্ষ স্থির শান্তি নামল মনে।

এক সময় সে উঠে পড়ল। তখন সবে ভোর হয়েছে। গাছের পাতায় সবুজের স্তরভেদ বোঝা যায় কি যায় না। রোগীর ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, সুরেশ বই বুকে করে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মুখে উদ্বেগ ও শ্রান্তির গভীর ছাপ পড়েছে। নার্স শোভার ভোরের টেম্পারেচার নেবার আয়োজন করছে। নিখিলেশ চোরের মত পা টিপে-টিপে প্যাসেজটা পার হয়ে ভিতরের দালানে এল, বাঁদিকে বেঁকে সেই ছোট ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালো, যেখানে শোভা পূজা করত, সেই কাঁদা-কাটার ঘর।

যেদিন থেকে শোভা এখানে পূজা করা শুরু করেছে, সেদিন

থেকে নিখিলেশ বোধহয় একটিবারও এ ঘরে ঢোকেনি, তাহলেও আজ এই পরিবেশে তার নিজেকে নতুন বলে মনে হল না। কেমন একটা পুরানো ঘনিষ্ঠতার চেতনায় সে বরং আরাম বোধ করল, যেন বহুদিন পথে বিপথে ঘোরার পর আজ আবার সে স্বঘরে ফিরে এল।

কোন বিগ্রহ নেই। পাথর বা মাটির মূর্তি কিছুই নেই। কেবল একটা ছোট চৌকির ওপর বসানো অত্যন্ত অপটু পটুয়ার হাতে আঁকা কতকগুলো কিম্ভূতদর্শন দেব-দেবীর পট। নিতান্তই মেয়েলি ব্যাপার। শোভা এ ঘর নিজের হাতে পরিষ্কার করত। সে অসুস্থ হওয়ায় চাকরে আর হাত দেয়নি। মেঝেয় ধুলো জমেছে, পট-গুলোর ওপরও একটা পাতলা ধুলোর স্তর পড়েছে। নিখিলেশ একটা একটা করে পট তুলে নিয়ে ধুলো সরিয়ে দিল। তারপর রুমাল নিয়ে কাচগুলো মুছল। তারপর রুমাল দিয়েই মেঝের ধুলো এপাশে ওপাশে কিছুটা সরিয়ে দিয়ে দরজা ভেজিয়ে সেইখানেই শুয়ে পড়ল, চোখ বুজে প্রার্থনার লাগাম আবার আলগা করে দিল,— বাঁচিয়ে দাও, বাঁচিয়ে দাও, শোভাকে বাঁচিয়ে দাও।

বেলা গড়িয়ে গেল অনেকখানি। মনে করে খেয়ে নেবে এমন মন নিখিলেশের ছিল না। কোথাও খুঁজে না পেয়ে সুরেশ পূজার ঘরের দরজা ভেজানো দেখে অনুমান করল, ভিতরে কেউ আছে দরজা ঠেলতেই নজরে পড়ল, নিখিলেশ উপুড় হয়ে শুয়ে মাথা চালছে আর ব্যাকুল স্বরে আপনার মনে কি বলছে। এক মুহূর্ত সুরেশ স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল।

সুরেশকে দেখেই নিখিলেশ সোজা হয়ে উঠে বসল। তার চোখের কোণে জল টল টল করছে। কান্নাকাটি করে প্রার্থনা করছিল, এ-কথা লুকোবার কোন উপায়ই ছিল না। তবু স্পষ্ট করে সে কথা সে বলতেও পারল না। নিজের মধ্যে যথাসম্ভব সহজ

মানুষের ভঙ্গী এনে যেন সুরেশের অনুচ্চারিত বিস্ময়ের জবাবেই বলল কোথাও আর ভাল লাগছে না ভাই, তাই এখানে এসে একটু বসলাম, ভাবছি হেস্ত-নেস্ত না হওয়া পর্যন্ত আর এ-ঘর থেকে বেরুবো না।

পুজোর ঘর, নিখিলেশের মানসিক সঙ্কট এবং তার বর্তমান চেহারা থেকে সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করে নিতে সুরেশের অসুবিধা হল না। আর কেউ হলে অন্ততঃ মনে মনে একবার বিদ্রূপের হাসি হাসত। জীবনভোর নাস্তিকতার বড়াই প্রথম সঙ্কটের আঘাতেই চুরমার হয়ে গেল। কিন্তু সুরেশ সে কথা ভাবল না, বোধ করি কোন কথাই ভাবল না। কেবল স্নিগ্ধ স্বরে বলল, খাবার দিয়েছে, খেয়ে না হয় আবার এস।

সেদিনটা কাটল। আরও দুটো দন নিখিলেশের ওই পূজার ঘরেই কেটে গেল।

সমস্ত রাত্রি হৈ-রৈ আর অনিদ্রায় কাটিয়ে শ্রোতারা প্রায় সকলেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কেবল গিরীন অনির্বাণ কৌতূহল নিয়ে শুনে যাচ্ছিল।

একটা ছোট ষ্টেশনে এসে গাড়ী থামতে বক্তা ভদ্রলোক এবং গিরীন ফিরিওয়ালাকে ডেকে চা পান করলেন। উষার খোলস থেকে দিনের পূর্ণ রূপটি বেরিয়ে আসছে।

গিরীন বললে, যাত্রা শেষ হয়ে এল। আপনি সংক্ষেপ না করলে শেষটুকু আর শোনা হবে না।

ভদ্রলোক বললেন, গল্পের মূল অংশে আমি এসে পড়েছি। কিন্তু পরিতাপ এই, এইখানটাই আমি নিজে কিছু বুঝি না। বোধ

করি সুরেশবাবুও কিছু বোঝেননি। তাই নিখিলেশের কাছ থেকে এখন তখন ছাড়া-ছাড়া ভাবে তার অভিজ্ঞতার যে ছবিগুলি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন সেইগুলিই জুড়ে আমাকে শুনিয়েছিলেন। কোন ব্যাখ্যা দেননি, আমিও দেব না।

তৃতীয় দিন ভোরবেলা। নিখিলেশ তখনও ঘুমিয়ে। ঠিক ঘুমিয়ে নয়, বহির্জগতের পক্ষে নিদ্রিত হলেও অবচেতন মনে প্রার্থনার অনুরণন চলছে আর অন্য একটি অহং, জাগ্রত অবস্থায় যার খোঁজ পাওয়া যায় না, যেন তফাত থেকে চেতনার একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে দাঁড়িয়ে সেই অনুরণন শুনছে।

দরজায় বারবার কে ধাক্কা দিল। অস্থির আঘাত। নিখিলেশ সজাগ হল, কিন্তু উঠলো না। সুরেশের অধীর স্বর শোনা গেল। খোল খোল নিখিল, আমি, শীগ্‌গির খোল।

স্বরে ব্যাকুলতার আভাস পেয়ে নিখিলেশ ত্বরিত হয়ে দরজা খুলে দিল। রাত্রি জাগরণ আর মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ে ক্লান্ত সুরেশ। তাকে বোধ করি এত বিচলিত আর কখনও দেখা যায়নি। তার চোখের আলো উদ্বেগে আর কি একটা অবর্ণনীয় ভয়ে কাঁপছে। নিখিলেশের একটা হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে সুরেশ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলল, শোভা মরে যাচ্ছে কিছুতেই রাখতে পারলাম না। আর সময় নেই। তুমি ওর পাশে গিয়ে একটুখানি বস। আমি ডাক্তার নিয়ে আসি।

নিখিলেশের সাড়ার অপেক্ষা না করে সুরেশ তার হাত ছেড়ে দিয়ে, আবার তখনই ত্বরিত পদে বেরিয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত নিখিলেশ নিস্পলক ভাবহীন দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন সুরেশের কথা তার কানে ঢোকেনি। কিংবা ঢুকলেও সে তার মর্ম গ্রহণ করতে পারিনি। তারপর অন্তরের গভীর

থেকে প্রকৃত অবস্থার উপলব্ধি সির সির করে সত্তার উপরকার স্তরে উঠে এল। শোভা মরে যাচ্ছে! কেউ বাঁচাতে পারল না। সৃষ্টির ভিতরে বাহিরে এমন কোন শক্তি নেই যা তাকে বাঁচাতে পারে।

শোভা মরে যাচ্ছে! নিখিলেশ কিছুতেই শোভার ঘরের দিকে ছুটে যেতে পারল না। একটা সীমাহীন নৈরাশ্যে সে যেন দেহের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে জড়ের মত সেইখানেই আবার বসে পড়ল। তারপর সদ্য মাতৃহীন শিশুর মত উপুড় হয়ে দুহাতের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল।

শোভার অসুখের বাড়াবাড়ি হওয়া থেকে যে মানসিক ধকল চলছে, পরাজয়ে আজ তার পরিসমাপ্তি। সমস্ত স্নায়ু একান্ত নির্জীব। কখন এক সময় নিখিলেশ অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাইরের কোন শব্দে নয়, সুপ্ত চেতনা যেন নিজেরই কোন তাড়ায় ত্বরিতপদে জাগরণের স্তরে উঠে এল। নিখিলেশ একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল। সমস্ত চেতনাকে আনন্দ-চকিত করে এই সংবাদ তার সত্তায় সত্তায় রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, সাড়া মিলেছে, সাড়া মিলেছে।

এই বোধ নিয়েই নিখিলেশ জেগে উঠল যে, সে একটা পরমাশ্চর্য অভিজ্ঞতার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওইটুকু ঘুমের মধ্যে কি ঘটেছে তা না উপলব্ধি হলেও এটা ধ্রুব বুঝল যে, তার প্রার্থনার সাড়া মিলেছে, সে নবজন্ম লাভ করেছে।

সে দেখল, তার চোখের সামনে একটা শুভ্র অমলিন জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধদ্যুতি জ্যোতিবিন্দু টলটল করছে, আর সেই জ্যোতির উৎস তার হৃদয়ে। দেখতে দেখতে সেই অদ্ভুত জ্যোতি ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে

হাজার বৈদ্যুতিক আলোর মত আশ্চর্য ছটা বিকীর্ণ করে চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে ফেলল। সেই জ্যোতি ক্রমশ বড় হয়ে মণ্ডলাকার ধারণ করে ঘরের আকাশ-বাতাস, দরজা-জানালা এবং যাবতীয় বস্তু-নিচয়ে অনুস্যুত হল। তারপর নাচতে নাচতে ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হল। ধীর তরঙ্গায়িত স্বচ্ছ জলাশয়ে পূর্ণচন্দ্রের বিম্বের মত উজ্জ্বল স্নিগ্ধ ও অমলিন জ্যোতি, কিন্তু আবার সূর্যের আলোর মত সতেজ ও সক্রিয়।

একটা অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দে নিখিলেশের হৃদয় ভরপুর হয়ে উঠল। সেই আনন্দ ওই জ্যোতির মত সক্রিয় ও সীমাহীন। প্রথম কিছুক্ষণ ওই আনন্দ ছাড়া তার আর কোন অনুভূতি ছিল না। তারপর সহসা মনে হল, এই জ্যোতি তার চোখের সামনে অধিকক্ষণ থাকবে না। যে অনন্ত প্রপঞ্চাতীত শক্তির কাছে সে শোভার জীবনের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা করেছে, এই জ্যোতি তারই প্রতীক। যা জ্ঞাতব্য তা জেনে নিতে হবে, যা চাইবার তা চাইতে হবে।

পূর্ণতার সেই পরম মুহূর্তে জ্যোতি চোখের সামনে প্রতিভাত অবস্থায় শোভার জীবনের মূল্য তার কাছে আর অসম্ভব বেশী মনে হল না। সৃষ্টিরহস্যের সমাধান যে হিরণ্যগর্ভ গুহায় নিহিত, তার দ্বার যার কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে, তার কাছে একটি নারীর বেঁচে থাকা না থাকায় কি এসে যায়? কিন্তু এই অভিজ্ঞতা স্থায়ী হবে না, এই জ্ঞানাতীত ভূমি থেকে তার মন আবার নেমে আসবে, তাকে আবার প্রাকৃত জীবনে ফিরে আসতে হবে, তখন একটা নির্মল, সাত্ত্বিক, পরহিতব্রতী জীবনযাপনে শোভা তাকে অমূল্য সহায়তা দিতে পারবে। শোভা কি বাঁচবে?

সেই জ্যোতির উদ্দেশ্যে নিখিলেশের মন মথিত করে স্থির অব্যাকুল প্রশ্ন উঠল, শোভা কি বাঁচবে?

জবাব যা এল, সে কান দিয়ে শুনলো না, কিন্তু শুনলো শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়েই, কিংবা, বোধকরি তাও না। হৃদয়ের যে কক্ষে সেই জ্যোতির উৎস, জবাবটা যেন সেখানে আকার লাভ করে তার চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হল। ক করে এই জবাব এল, সে সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে বোঝাতে গিয়ে নিখিলেশ সুরেশকে বলেছিল, তার জিজ্ঞাসা যেন নিজেই মনের অতলান্ত গভীরে ডুবে গিয়ে রূপ পালটে জবাব হয়ে তার চক্ষু এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছে যুগপৎ প্রত্যক্ষ হল।

বাঁচবে. বাঁচবে, জবাব এল, এই মুহূর্ত থেকে শোভার বিপদ কেটে গেল, তার আরোগ্য শুরু হল।

নিখিলেশ আবার প্রশ্ন করল, কতদিনে শোভা সম্পূর্ণ সুস্থ হবে?

ঠিক একইভাবে উত্তর প্রত্যক্ষ হল, অসুখের পূর্বে শোভার যে স্বাস্থ্য ছিল, এখন থেকে তুমাস পরে সেই স্বাস্থ্য সে ফিরে পাবে।

মনের মধ্যে আরও অনেক লঘু ও গুরু জিজ্ঞাসা ধীরে ধীরে গুড়ি মেরে মেরে এগিয়ে আসতে লাগলো—সাংসারিক ছোটখাট বিষয়ের প্রশ্ন, নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন, সৃষ্টিতত্ত্ব ও মানুষের সম্ভাবনা সম্বন্ধে প্রশ্ন। নিখিলেশ অনুভব করল, ওই জ্যোতি শুধু অনন্ত শক্তি নয়, অনন্ত জ্ঞানও। ত্রিকালের সমস্ত সত্য ওই জ্যোতির মধ্যে নিহিত। ওই জ্যোতির উদ্দেশ্যে যা কিছু জিজ্ঞাসা উঠবে, তারই একমাত্র সত্য সমাধান নিঃসংশয় প্রত্যক্ষ হবে। কিন্তু অন্তরে বাহিরে সমস্ত কিছু জুড়ে ওই অখণ্ড মণ্ডলাকার জ্যোতির উপস্থিতি নিখিলেশের চিত্তে এমনই একটি পূর্ণতার আমেজ এনে দিয়েছিল যে, তার কাছে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিজ্ঞাসাগুলো নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর মনে হল। যে একমাত্র জবাবে মানুষের মনের ছোট-বড় সমস্ত প্রশ্নের উত্তর মিলে যায়, সেই জবাব তার সমুখে, যা চেয়েছিল, তা পেয়েছে। এই সুগভীর

পূর্ণতার মধ্যে অন্য কোন প্রশ্ন স্থানকালের অনুপযুক্ত প্রগল্‌ভতা মাত্র।

কিছুক্ষণের জন্য নিঃসীম স্তব্ধতায় নিখিলেশের মন ভরে গেল। কেবল 'আমি জ্যোতির্ময়' 'আমি আনন্দময়' এই অনুভূতি চিত্তময় পরিক্রমা করতে লাগল।

এই অবধি বলে ভদ্রলোক হঠাৎ 'একটু আসছি' বলে উঠে পড়লেন। গল্প বলতে গিয়ে অতীতে মন নিবদ্ধ হওয়ার দরুণ চোখে যে ঘোর এসেছিল, উঠার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা কেটে গেল। প্যাসেজের মধ্যে কে একটি ট্রাঙ্ক ফেলে রেখেছিল, বোধহয় রাত্রে শোয়ার সুবিধার জন্য, সেটাকে দুহাত দিয়ে যত্ন করে বেঞ্চের তলায় চালান করে দিয়ে ভদ্রলোক বাথরুমের দিকে এগুলেন। চলার সময় প্যাসেজের ওপর পায়ের উঠানামায় হাঁটুর পিছনদিকে ধুতির ধার দুটো একবার যুক্ত হচ্ছিল, একবার সরে যাচ্ছিল, সেদিকে চেয়ে সুবোধ বললে, পায়ের ডিমটা কেমন সুন্দর দেখেছ। ভদ্রলোক ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই য়্যাথলেট ছিলেন।

গিরীন উড়িয়ে দিয়ে বললে, ধ্যেৎ, য়্যাথলেট! ভদ্রলোক নিশ্চয়ই যোগ অভ্যাস করেন। তাই উপরে নীচে সমস্ত শরীরটি অমন আঁট আর চিকণ।

সত্যি কথা বলতে, রমেশ মন্তব্য করলে, আমি সমস্ত গল্পটা শুনিনি। কিন্তু যেটুকু শুনেছি, আমার নিশ্চয় ধারণা, এই ভদ্রলোকই সুরেশ। নাম লুকিয়ে গল্পটি বলছেন। এর আর কি? ভদ্রলোককে নামটা জিজ্ঞাসা করলেই হয়, সুবোধ বললে।

কি দরকার, গিরীন আপত্তি করল, নাম না প্রকাশ করে গল্পটা

বলে ভদ্রলোক যদি আরাম বোধ করেন, সে সুরেশ হোন আর না হোন, ফস্ করে নাম জিজ্ঞাসা করে বে-আব্রু করার কি প্রয়োজন আছে ?

ধিক ধিক ধিকিতাং, ধিক ধিক ধিকিতাং—পূর্ণগতি বেনারস একসপ্রেসের চলার একঘেয়ে সঙ্গীত দুদিকের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে, চক্রবালের কাছাকাছি একটা মস্ত কালো মেঘের পাড়ে জরি জাগিয়ে একটুখানি দুর্বল রোদ উঠেছে। গাড়ীর মধ্যে এই দল ছাড়া আর যাঁরা বাঙ্গালী যাত্রী ছিলেন, প্রায় সকলেই উঠে পড়েছেন। ফোলা ফোলা চোখে অর্ধ সজাগ মনে অনুভব করছেন, গাড়ীর গতি মন্দ হয়ে আসছে কি না, গন্তব্যে পৌঁছানোর অধীরতায় নয়, পরের স্টেশনে গাড়ী লাগলে চা পাওয়া যাবে এই আশায়। কেবল দু'একজন প্রবীণ মাড়োয়ারী ভদ্রলোক কাঁধে গামছা ফেলে কানে পৈতা জড়িয়ে এখন থেকেই বাথ-রুমের দিকে শৌচ-সংক্রান্ত আনাগোনা শুরু করেছেন।

গিরীন বললে, যাই হোক, ভদ্রলোক কে, এ কথা অবান্তর। আমি ভাবছি, নিখিলেশের ওই যে অবস্থাটা হল, জ্যোতি দর্শন করল, দৈববাণী শুনল, ওটা কি ? নিশ্চয়ই সমাধি।

সুবোধ এবার গিরীনকে ধমক দিয়ে উঠল। বললে, রাখো তোমার সমাধি। ওই যে দেখনা, ছেলের খুব অসুখ করল মা গিয়ে তারকেশ্বরে তিন দিন তিন রাত না খেয়ে না দেয়ে ঘাড় মুড় গুঁজে পড়ে রইল আর মহাদেবের কথা ভাবতে লাগল। তারপর স্বপ্ন পেল, আচ্ছা যা, এই এই করগে যা, তোর ছেলে সেরে যাবে,—এও সেই জাতীয় ব্যাপার আর কি !

গিরীন চিন্তিত হল। তার পারিবারিক ঐতিহ্যে ধর্ম চর্চার অভ্যাস থাকায় সে অল্প বয়সেই অনেকগুলো আধ্যাত্মিক শব্দ শিখে ফেলে-

ছিল। কিন্তু বয়সোচিত কাঁচা বুদ্ধি দিয়ে বিষয়টার ঠিক বেড় পেল না। বিমূঢ়ের মত মাথা চুলকিয়ে বলল, তাই বলছ ?

নন্দগোপাল বললে, তোমরা আদি প্রসঙ্গটাই ভুলে যাচ্ছ। সমাধিই হোক আর হত্যা দেওয়াই হোক, নিখিলেশের দর্শনের মধ্যে এমন কি আছে যে, সাধুর আত্মহত্যার কথা উঠতে পারে ?

ভদ্রলোক এইসময় বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। সীটে বসে রুমাল দিয়ে ভাল করে হাত-মুখ মুছলেন। সুবোধের কথা শুনতে পেয়েছিলেন। বললেন, আমি এখনও শেষ করিনি। সবটুকু শুনলেই আপনার কৌতূহল মিটবে।

তারপর স্যুটকেশ খুলে পিজবোর্ডের বাক্স থেকে একটা চুরুট বার করে ধরিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন। অতীতে মন নিবিষ্ট হওয়ায় সেই আশ্চর্য ঘোর ভদ্রলোকের চোখে আবার নেমে এল।

ওইভাবে কতক্ষণ কাটল, নিখিলেশের ঠিক খেয়াল ছিল না। আমাদের প্রাকৃত চেতনার সীমান্ত স্থান কালের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতায় যখন এই প্রাচীর সরে যায়, তখন মনের যে কি অবস্থা হয়, তা আমার ধারণা নেই। তবে এটা অনুমেয় যে, ঘণ্টা মিনিটের হিসাব থাকে না। যখন ভাল করে সম্বিৎ ফিরল, নিখিলেশ জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখল, রোদ শিশুগাছের মাথা থেকে অনেকখানি নেমে এসেছে, বেলা হয়েছে।

আমি আগেও আপনাদের বলেছি, আবার বলে রাখি, অতি-প্রাকৃত দর্শনের আমার কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই, কাজেই নিখিলেশের মনের সেই সময় যে অবস্থা হয়েছিল, তার কোন ব্যাখ্যা আমি দিতে পারব না। আর ঠিক সেই কারণেই ব্যাখ্যা করতে পারব না, কেন অল্পকাল মধ্যেই তার চেতনা যতই বাহ্যসত্তার মধ্যে

অবরোহণ করতে লাগল, একটা চোরা অস্থিরতা যেন একটা শিশু বানরের মত তার মনের আনাচে-কানাচে আবার লাফঝাঁপ শুরু করল। এই অস্থিরতা সংশয় নয়, কারণ ঠিক সেই সময়টিতে তার অভিজ্ঞতা তার কাছে ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর মতই প্রত্যক্ষ। এই অস্থিরতা বর্তমান অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ সংশয় সম্ভাবনার আশঙ্কা।

সকালের মিষ্টি রোদে জ্বলজ্বল আকাশটা জ্যোতিগর্ভ। কিন্তু জ্যোতি আর অখণ্ড নেই। মণ্ডলাকার নেই। আনন্দময় জ্যোতি ফেটে ফেটে যাচ্ছে, সরে সরে যাচ্ছে, পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতি পৃথক হয়ে একে অন্যের পিছনে ধাওয়া করে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধি বুঝি আবার মানস রাজ্যের রাজদণ্ড নিজের হাতে তুলে নেবার জন্য হাত বাড়িয়েছে। অপূর্ব শান্তির চক্রবালে একটা বিষাদের ছায়া নেমে আসছে। শোভা কি সেরে উঠবে? সেরে উঠবেই। কিন্তু সে তো চিকিৎসার গুণে স্বাভাবিক নিয়মেও সেরে উঠতে পারে। কয়েক ঘণ্টা, নয়তো কয়েকদিন, না হয় তো কয়েক মাস পরে এই জ্যোতি তার চোখের সামনে থেকে সরে যাবে হৃদয়ের উৎসেও হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে বিলীন হয়ে যাবে। বাধ্য প্রজার মত মন বুদ্ধিকে খাজনা দিয়ে পঞ্চেন্দ্রিয়ের শাসন মেনে চলবে। স্মৃতিতে একটা সংস্কার ছাড়া এই দর্শনের কোন রেখাই আর মনে থাকবে না। তখন কোন সাক্ষ্য, কোন প্রমাণের বলে বুদ্ধিকে নিশ্চয় করে বোঝাবে যে, শোভা তার প্রার্থনার ফলে অনন্ত শক্তির অলৌকিক প্রসাদ লাভ করেই বেঁচে উঠেছে, ডাক্তারের হাতযশে নয়। যে চোখ-কানের কোতোয়ালিতে তাকে থাকতে হবে, তারা তো বুদ্ধির দরবারে বার বার ঘাড় নেড়ে এই কথাই বলবে যে, না না, ওই অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য তারা নয়, ওর সত্যতা তারা আদৌ মানে না, যা নিখিলেশ দেখেছে, তা শুধু আর্ত

বিকারগ্রস্ত মনের রুগ্ন কল্পনাবিলাস মাত্র। নিমজ্জমান মানুষ পরিত্রাণের আশায় যেমন করে জলে ভেসে যাওয়া তৃণখণ্ডটিকেও আঁকড়ে ধরতে চায়, শোভার আয়ুষ্কামনায় সে ঠিক তেমনি করেই অনন্ত পুরুষের কাছে প্রার্থনা শুরু করেছিল। কিন্তু তার ফলে যখন সত্য দর্শন হয়েছে, যখন জ্যোতির্ময়ের দ্বার তার কাছে খুলে গেছে, তখন সে কি শুধু শোভার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে। যতদিন সে বেঁচে থাকবে, ততদিন এই সত্য নিঃসংশয় হয়ে অক্ষয় হয়ে তার চিত্তে জাগরুক থাকবে, এই যদি না হল, তাহলে, শোভা থাকুক আর না থাকুক, বাকী জীবনটা তার কাছে শুধু জৈব দিনযাপন ছাড়া আর কোন অর্থেই সার্থক হবে না।

আবার নিখিলেশের মন দুলে উঠল। এমন কিছু ঘটুক, এমন কোন অদ্ভুত সম্ভব হোক, যা প্রাকৃতিক নিয়মে হয় না, যা শুধু অলৌকিক শক্তির ক্রিয়াতেই সম্ভব। সেই স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর ঘটনাকে সে সাক্ষ্য বলে মেনে নেবে। ভবিষ্যতে যদি কোনদিন বুদ্ধি এই অভিজ্ঞতায় সংশয়ান্বিত হয়, ইন্দ্রিয়দল সাক্ষ্য দিতে অসহযোগ করে, তবে সে সেই অদ্ভুত সংঘটনকে কাঠগড়ায় তুলে দেবে, শপথ লাগবে না, হলফ লাগবে না, ইন্দ্রিয় বিস্মৃতির জন্য লজ্জিত হবে, বুদ্ধি সেই সাক্ষীর কাছে শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করবে।

অবশ্য, নিখিলেশ যে তখনই এমনই করে তার্কিকের মত নিজের মনের সঙ্গে বিচার করতে বসে গিয়েছিল, তা নয়; তবে এমনি একটা চাপা আশঙ্কা মনকে বিচলিত করেছিল বলেই সে সেই অলৌকিক অভিজ্ঞতার একটা স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর সাক্ষ্যের জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। এমন কোন অদ্ভুত ঘটনা কি ঘটবে না ?

মানস চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে জ্যোতির উৎসস্থল হৃদয়ের সেই গুহায় হাঁতড়ে বেড়াল উত্তরের জন্য। ভাঙা ভাঙা জ্যোতি আবার কেন্দ্রীভূত

হল, তেজস্কর হল। বাইরে ভিতরে চক্ষু এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছে যুগপৎ উত্তর প্রত্যক্ষ হল।

হবে, সুস্পষ্ট জবাব এল। শোভাকে যে ডাক্তার দেখছেন, সুরেশ তাকে খুঁজে পাবে না। প্রতিবেশী আর একজন ডাক্তার, প্রবীণ, সন্থ পশ্চিম থেকে আগত, চোখে সেল-ফ্রেমের মোটা চশমা, তাঁকেই সুরেশ নিয়ে আসবে। শোভার ঘরে গেলেই তাঁকে দেখা যাবে। এই ঘটনাই হবে সাক্ষ্য।

শান্তি, শান্তি। সুস্পষ্ট এবং অদ্বয়ার্থক উত্তর। নিখিলেশ যেন দেখতে পেল, এবার আর মানস প্রত্যক্ষ নয়, শুধু কল্পনায়, সে শোভার ঘরে গেছে, দুর্বল শোভা স্মিতহাস্যে তাকে অভ্যর্থনা করছে আর বছর পঞ্চাশ বয়সের মোটা কালো ফ্রেমের চশমা পরা হৃষ্টপুষ্ট রাসভারী ডাক্তার কানে স্টেথ্‌স্কোপ লাগিয়ে শোভার বুক পরীক্ষা করছেন এবং তার হৃৎপিণ্ডের ধুক্ ধুক্ শব্দের মধ্যে উদ্বিগ্ন হবার মত কোন সঙ্কেতই পাচ্ছেন না। কল্পনাটা মনে আসতেই সে রোমাঞ্চিত হল। ঘটবেই, এ ঘটবেই।

প্রমাণ হিসাবে নিশ্চয়ই এই একটা সাক্ষ্যই যথেষ্ট হত। সুরেশ গৃহ-চিকিৎসকের দেখা পাবে না, নিকট-প্রতিবেশী অন্য একজন চিকিৎসককে নিয়ে আসবে, তিনি সন্থ পশ্চিম থেকে আসবেন, তাঁর বয়স হবে পঞ্চাশোর্ধে এবং শোভার ঘরে গেলেই নিখিলেশ তাঁকে দেখতে পাবে, এতগুলি ঘটনার যুগপৎ সংঘটন কেবল একটা আকস্মিক যোগাযোগ হতে পারে না। অলৌকিক দর্শনের সাক্ষ্য হিসাবে অলৌকিক শক্তি-প্রসাদেই এতগুলির যোগাযোগ সম্ভব।

কিন্তু মনের তত্ত্বের জটিলতার বুঝি সীমা নেই। এই সব ঘটনার যোগাযোগ হবেই, এতে যেমন নিখিলেশের সংশয় রইল না,

সংশয়াতীত সাক্ষ্য হিসাবে এগুলিকে যে বুদ্ধি চিরদিন মেনে নেবেই, এ সম্বন্ধেও সে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারল না। উত্তর যদি মেলে অনেকগুলি অপ্রত্যাশিত ঘটনার যোগাযোগ হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু অপ্রত্যাশিত তো অদ্ভুত নয়। সকালবেলা গিয়ে সুরেশ গৃহ-চিকিৎসকের দেখা পাবে না, এতে অদ্ভুত কিছু নেই, কোন ভারী রোগীর ডাকে ডাক্তারকে হয়তো বেরিয়ে যেতে হয়েছে। সম্ভ পশ্চিম থেকে আগত কোন ডাক্তার নিকটেই বাসা নিয়েছেন, এতেই বা আশ্চর্যের কি আছে। তারপর তিনি প্রবীণ হবেন এবং তাঁর চোখে কালো ফ্রেমের চশমা থাকবে, এর মধ্যেও কিছু অসম্ভবের সম্ভাবনা নেই। ঘটনার স্বাভাবিক যোগাযোগে নয়, কেবল অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে অলৌকিক দর্শনের সাক্ষ্য হিসাবেই এগুলি ঘটল, এমন কথা বুদ্ধি নিশ্চয় করে মানবে কেন ?

একটা অসহায় বিষাদে নিখিলেশের মন ভারাক্রান্ত হল। এই বিষাদ যে তার সমস্ত ব্যক্তিত্বকে অভিভূত করে ফেলল, তা' নয়। তার অহং বোধের কাছে নিজের মনটা যেন তিনটি পৃথক স্বতন্ত্র স্তরে সুবিভক্ত হয়ে গেল। গভীরতম স্তরে আনন্দময় পূর্ণতার অনাবিল নিস্তরঙ্গ শান্তি ছাড়া আর কিছু নেই। মনের এই গভীরে শোভা বাঁচল কি মরল, তার কাছে কিছুই আসে যায় না। এই অলৌকিক দর্শনের কোন ইন্দ্রিয়গোচর সাক্ষ্য রইল কি না রইল, এ প্রশ্নই এর কাছে অবান্তর। সে অতীতে যা ছিল এবং ভবিষ্যতে যা হবে, তার পূর্ব এবং পর, সমস্ত কিছু চিরকালের জন্য সেই অলৌকিক দর্শনের মুহূর্তটিতে সংহত হয়ে গেছে, সেই মুহূর্তের বাইরে মনের এই স্তরে তার কাছে ত্রিভুবনে আর অন্য সম্ভাব্য কিছু নেই, এ জন্মে না, যদি জন্মান্তর থাকে, সেখানেও না। ভাল বা মন্দ, শ্রেয় বা প্রেয়, সুখকর বা দুঃখজনক, এ-সব সমান্তরাল অনুভূতির ভেদ চিরকালের জন্য

এখানে লুপ্ত হয়ে গেছে, তাই ভবিষ্যতে কি ঘটবে তার কোন প্রত্যাশাতেই এই মন অস্থির নয়।

দ্বিতীয় এবং অপেক্ষাকৃত অগভীর স্তরে এই অলৌকিক দর্শন তার জীবনে সর্বপ্রধান এবং সর্বাপেক্ষা সার্থক ঘটনা হয়ে রইল। একমাত্র সুর নয়, কিন্তু মূল সুর। ভবসাগরে যখনই যখনই তার জীবনের পোত ঝড়ে ঝঞ্ঝায় ডুবুডুবু হবে, মাস্তুল ভেঙ্গে যাবে, তট-রেখা দৃষ্টির অগোচর হবে, এই দর্শনের স্মৃতি তখনই তখনই বন্দরের সু-উচ্চ আলোকস্তম্ভের মত তাকে আশা দেবে; কূলের সন্ধান জানাবে। মনের এই স্তরেও এই অলৌকিক অভিজ্ঞতায় সংশয়ের কোন প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু শোভা বেঁচে উঠুক, তার জড় দিনগুলি আলোকে, আনন্দে, ছন্দে সুষমায় ভরে উঠুক, আর এই দর্শনের স্মৃতি অতীন্দ্রিয়ের সঙ্কেত স্বরূপ সারাক্ষণ তার মনে জাগরূক থাকুক, এইটুকুই হল এই স্তরের প্রার্থনা।

কিন্তু বিপদ হল মনের সবচেয়ে উপরকার স্তর নয়ে, যে স্তর থেকে মন আমাদের জীবনের দৈনিক পরিক্রমা চালনা করে। অশুদ্ধ, অসম্পূর্ণ, অঙ্গহীন বুদ্ধিকে ছাড়া মন এই স্তরে আর কাকেও প্রভু বলে মানে না আর সেই বুদ্ধির মন্ত্রী দশেন্দ্রিয়। মনকে এই স্তরে না সন্তুষ্ট করতে পারলে, সত্য দর্শনে তার চেতনা যতই উদ্বুদ্ধ হোক না কেন, বাকী জীবনের দৈনিক বেঁচে থাকায় এই অলৌকিক অভিজ্ঞতা কোন আনন্দ কোন পবিত্রতাই এনে দিতে পারবে না।

মনের এই স্তরে নিখিলেশ প্রান্ত থেকে প্রান্ত অবধি অস্থির হয়ে উঠল। যা প্রাকৃতিক ভাবে সম্ভব, বুদ্ধি তাকে অপ্রাকৃতিক শক্তির প্রকাশ বলে মানবে না। প্রকৃতিতে যা ঘটে না, এমন কিছু ঘটুক, তবেই অতিপ্রাকৃতিক লীলার সাক্ষ্য হিসাবে বুদ্ধি তাকে স্বীকার করবে।

অস্থিরতার চূড়ায় এসে আবার উপর থেকে নীচে অবধি সব মনটা শান্ত হয়ে গেল। কে যেন আসছে, অতিপরিচিত এক তরুণ, নিখিলেশ মানসচোখে আবার দেখতে পেল। ক্রমে পূর্ণ রূপটা পরিস্ফুট হতে সে বুঝতে পারল, যে আসছে, সে হিতাংশু। শোভার খুড়তুতো ভাই। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর কাজ করে। শোভার চেয়ে বছর তিনেকের বড়। পাতলা, ছিপ্ছিপে চেহারা, ফ্যাকাসে ফরসা রং, খুব লম্বা চুল রাখে, কয়েক গাছা চুল কুঁকড়ে ছোট একটু ঝুঁটি মত হয়ে কপালের ডানদিকে ঝুলতে থাকে।

নিখিলেশের হৃদয়ে সুস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠল। দিল্লী স্টেশনের প্লাটফর্মে হিতাংশু কুলির মাথায় সামান চাপিয়ে যাত্রীদের ভিড় ঠেলে কামরা থেকে কামরায় ছুটোছুটি করছে ওরি মধ্যে কোনটায় অপেক্ষাকৃত কম ভিড় বেছে ওঠবার জন্য।

কবে? হিতাংশু কবে আসবে তার কাছে?

উত্তর খুব স্পষ্ট নয়। শুধু মনে হল খুব শীঘ্র, সাত আট দিনের মধ্যেই হিতাংশু আসবে।

অল্পক্ষণের জন্য নিখিলেশের সত্তার দুকূল ছাপিয়ে আবার শান্তির ঢল নামল। এই তো মিলেছে দ্বিতীয় সাক্ষ্য। এই অলৌকিক দর্শনের দ্বিতীয় ইন্দ্রিয়গোচর সাক্ষ্যস্বরূপ দিল্লী থেকে অতি শীঘ্রই হিতাংশুর আগমন ঘটছে।

প্রথম এবং দ্বিতীয় সাক্ষ্য যেমন দেখল, ঠিক ঠিক তেমনটিই যদি ঘটে, তবুও কি বুদ্ধির সংশয় ঘুচবে না? এমন দুটো অপ্রত্যাশিত ঘটনার সংঘটন যে প্রাকৃতিক ঘটনাপরম্পরাতে হতে পারে না, কেবল ঐশী শক্তির সক্রিয়তায় সম্ভব, এও যদি বুদ্ধি না মানে, তাহলে সেই বুদ্ধিকে ক্ষয়িষ্ণু অঙ্গের মত সে নির্মমভাবে জীবন থেকে বর্জন করতে পারবে না?

কিন্তু সে নিশ্চয় জানে, এ সম্ভব নয়। যতই আস্ফালন করুক, বুদ্ধিকে নির্মূল করে জীবনযাপন সম্ভব নয়। নিখিলেশের অন্তরাত্মা বেদনায় কেঁদে উঠলো। এ-অন্যায়, এ-অপরাধ, এ-পাপ! তার চঞ্চল ও অপদার্থ, গুরুর মুখোস-পরা বুদ্ধি আজ হঠাৎ চূড়ান্তভাবে সেই মুখোস খুলে পড়ায় তার প্রতি ক্রূর প্রতিহিংসায় ক্ষেপে উঠেছে, এ তারই সঙ্কেত! এই মুহূর্তে তার ছুটে যাওয়া উচিত শোভার ঘরে, সেখানে গেলেই সে দেখতে পাবে, প্রথম সাক্ষ্য সুন্দরভাবে যথানির্দিষ্ট-ভাবে মিলে গেছে। দেখেই তার মন নিঃসংশয় হবে, সেই মুহূর্ত থেকেই তার জীবন শাশ্বত আনন্দে ভরে যাবে।

কিন্তু সত্য সত্যই বুঝি বুদ্ধির ক্রূর প্রতিহিংসায় নিখিলেশ সেখান থেকে নড়তে পারল না, ব্যাকুলচিত্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। আর তার মনের বাহ্যস্তরের কোন কেন্দ্র থেকে অফুরন্ত জিদ উঠতে লাগল, একটা কিছু ঘটুক। প্রকৃতি-বিরোধী কোন অসম্ভব সম্ভব হোক, এই দর্শনের অভ্রান্ততার প্রমাণ হিসেবে বুদ্ধির কাছে যা চিরকাল গ্রাহ্য হয়ে থাকবে।

হঠাৎ তার চোখের সামনে ভাঙা ভাঙা জ্যোতির মণ্ডল কিছুক্ষণ বেগে ঝিকমিক করে একটা প্রকাণ্ড আঁধারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। তারপর সেই আঁধারের অভ্যন্তরের দূরতম প্রান্ত থেকে ক্ষুদ্র একটি হরিদ্রাবর্ণের বিন্দু জোনাকির মত মৃদু আলো বিচ্ছুরণ করে আকাশ-পথে যেন ছুটে ছুটে তার দিকে আসতে লাগল। একেবারে কাছা-কাছি এলে নিখিলেশ দেখতে পেল হরিদ্রাভ বস্তুটা ঠিক বিন্দুর আকার নয়, দৈর্ঘ্যে আধ আঙ্গুলের মত হবে এবং মধ্যখানে ঈষৎ বাঁকা, যেন পুতুলের একটি মোষের শিং। দেখতে দেখতে শিংটা যেন নিখিলেশের কপাল স্পর্শ করে গভীরভাবে ভিতরে বসে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়ের বাণীভূমি থেকে যেন ভাষা উঠল, ওই শিং

তোমার কপালে উঠবে আর সেই প্রকৃতি-বিরোধী ঘটনা হবে এই জ্যোতি দর্শনের চরম সাক্ষ্য।

কি হল নিখিলেশের মধ্যে, সে অচেতন হয়ে পড়ে যাচ্ছিল। একটা বিরাট স্থৈর্য আর একটা প্রচণ্ড উত্তেজনা যুগপৎ পাল্টাপাল্টি করে এবং পাশাপাশি তার হৃদয়কে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মত এমনভাবে নাড়া দিল এবং নাড়া দিতে পারল না যে, সে অতি কষ্টে বুদ্ধিকে সজাগ রেখে মূর্ছা থেকে নিজেকে রক্ষা করল। তার চোখের সামনে আর সেই জ্যোতি নেই, আঁধারও নেই, স্বাভাবিক মানুষের দৃষ্টি যেন তার কাছে আবার ফিরে এসেছে। শুধু জ্যোতির একটা রেশ তার অনুভূতিকে তখনও পাকিয়ে পাকিয়ে জড়িয়ে আছে। একটা হরিদ্রাভ মোষের শিং যে তার কপালে একদিন গজিয়ে উঠবে, কেমন করে যেন এ তার কাছে অসম্ভবও বলে মনে হল না। কল্পনার একটা বীভৎস কিম্ভূত উৎপীড়ন বলেও এ সম্ভাবনাকে সে উড়িয়ে দিল না।

আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করে নিখিলেশ দ্রুতপায়ে শোভার ঘরের ভিতর প্রবেশ করল। ডাক্তার, ডাক্তার কই? সেল-ফ্রেমের চশমা পরা? ঘরের কোনখানে ডাক্তার নেই। নিখিলেশ শোভার কাছে না গিয়ে কেবল চারিদিকের দেওয়ালে এমন প্রত্যাশার দৃষ্টিতে চাইতে লাগল যেন, স্টেথসকোপ হাতে করে ডাক্তারবাবু এই ঘরের দেওয়াল ফুঁড়ে এখনই বেরিয়ে আসবেন।

শোভা ক্ষীণ স্বরে কি বলল, নিখিলেশ শুনতে পেল না। ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দেখল সুরেশ। বলল, সুরেশ, ডাক্তার কই?

সুরেশ নিখিলেশকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললে, নিখিল এসেছ। বেশ হয়েছে। দেখনা, কতক্ষণ বসে রইলাম, ডাক্তার

চ্যাটার্জি কাল রাত্রে কলকাতার বাইরে কি আর্জেন্ট কলে বেরিয়েছেন অনেকক্ষণ বসেও ফিরলেন না। অগত্যা, পাশেই আর একটি নূতন ডাক্তার, অবশ্য বয়স হয়েছে, শুনলাম হাতযশও আছে, তাঁকেই খবর দিয়ে এসেছি এই এসে পড়লেন বলে।

নিখিলেশ সুরেশের কথায় ব্যগ্রভাবে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে যাচ্ছিল। সে থামতেই জিজ্ঞাসা করল, কত বয়স হবে ?

বছর পঞ্চাশ মনে হল, সুরেশ বললে।

চোখে চশমা আছে ?

হ্যাঁ। কেন, ডকটর বসু তোমার চেনা লোক ? চোখে বেশ মোটা কালো ফ্রেমের চশমা আর চেহারাও ভারী।

নিখিলেশ সুরেশকে জড়িয়ে ধরলে। তারপর আবার ছেড়ে দিয়ে বললে, চেনা, চেনা, বিশেষ চেনা। তারপর অস্থির হয়ে বারান্দায় পায়চারী করতে লাগল। অচিরে গলির মোড়ে ডাক্তার বসুর মোটর দেখা গেল।

ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নামতেই সুরেশ নমস্কার করে অভ্যর্থনা করল। সুরেশ আশা করেছিল, নিখিলেশের পরিচিত, সেও নমস্কার করবে এবং আপ্যায়নসূচক দু একটা কথা বলবে। কিন্তু নিখিলেশ বারান্দায় একটা কোণে একেবারে নিশ্চল এবং নিস্পলক হয়ে ডাক্তার বসুর দিকে চেয়ে রইল। যা সে শুনেছে এবং এখন যা দেখছে সেই বর্ণনায় এবং চেহারায় পরিপূর্ণ মিলে গেছে।

নিখিলেশ একবার আপাদমস্তক রোমাঞ্চিত হল, তারপর হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়ে গেল।

এইবার যে স্টেশনে এসে ট্রেন থামল, তার পরেই বেনারস

কামরার মধ্যে গোছগাছ, বাঁধা-ছাঁদার ধুম পড়ে গেল। বেঞ্চের তলা থেকে ট্রাঙ্ক বের করা, ওপর থেকে সুটকেশ নামানো, হোল্ড-অলের মধ্যে বিছানা বালিস ভরে বেল্ট্ বাঁধবার সময় জোর করে দম নেওয়া এবং ততোধিক জোরে দম ফেলা, টিফিন-কেরিয়ারের বাটিগুলি সাজিয়ে স্ক্রু এঁটে দেওয়া, 'সরুন সরুন,' 'একটু দেখি স্যার,' 'দাদা, আমার মাথাটা বাঁচিয়ে,'—প্রভৃতি উচ্চ, মধ্যম এবং নিম্ন-গ্রামের নানাবিধ শব্দ এবং চীৎকারে ঘরের হাওয়া গরম হয়ে উঠল। ছেলেরা খুব তাড়াতাড়ি পরস্পরকে সাহায্য করে বাঁধা-বাঁধি শেষ করে আবার নিশ্চিন্ত হয়ে বসল।

গিরীন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল, কই, আপনি বিছানাটা গুটিয়ে নিলেন না ?

ভদ্রলোক মিষ্ট কৌতুকের দৃষ্টিতে ছেলেদের হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি লক্ষ্য করছিলেন। বললেন, আমি সকলের শেষে নামি। বেনারসে গাড়ী থামলে শুধু বিছানাটা বেঁধে ফেলার অনেকসময় পাব।

আর একটি ছেলে, খুব পান খায়, দুটি পান নিজে মুখে দিয়ে শব্দ করে চিবোতে চবোতে ভদ্রলোকের দিকে ডিবাটি এগিয়ে ধরে বললে বেশ গল্প। নিখিলেশ যা যা স্বপ্ন দেখেছিল, সব মিলে গেল। তারপর ?

ভদ্রলোক হাত দুটি জোড়া করে পান অস্বীকার করে বললেন, স্বপ্ন নয়, ট্রান্স বলতে পারেন বরং। তারপর আর কি, বেনারস ষ্টেশন এসে গেল, আমার কথাটিও ফুরালো।

গিরীন ঔৎসুক্যের সঙ্গে বললে—সে কি কথা? আরগুলো মিললো কি না বলুন। নিখিলেশের কপালে কবে শিং উঠলো ? শেষ অবধি নিখিলেশের কি হল ?

ভদ্রলোক আবার কথার সূত্র টেনে শুরু করলেন।

সবই মিলে গেল। শোভার জীবনাশঙ্কা তখনই কেটে গিয়েছিল। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ডাক্তার বসু'র চিকিৎসায় সে মাস দু'য়েকের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। শোভার খুড়তুতো ভাই হিতাংশুও যথাসময়ে এসেছিল খোঁজ নিতে এবং সে আসার সঙ্গে সঙ্গে অতীন্দ্রিয় দর্শনের সাক্ষ্যগুলো মেলা না মেলা নিয়ে নিখিলেশের মনে যে ঔৎসুক্য ও ব্যগ্রতার দুলুনি ছিল, তাও স্থির হয়ে গেল।

বৎসর খানেক নিখিলেশের মন অথৈ শান্তির মধ্যে ডুবে রইল। প্রীতি, মৈত্রী, করুণা ও সহানুভূতির ধারা নিখিলেশের সত্তা থেকে উৎসারিত হয়ে তার প্রতিবেশী, তার সহকর্মী বিশ্বজগতে যে কেউ তার সংস্পর্শে এল, তাদের সবাইকে এই সময়ে এমন অভিষিক্ত করে দিত যে, সুরেশ মনে করল, নিখিলেশের মধ্যে যে মহিমময় সম্ভাবনা সুপ্ত ছিল, এতদিনে তার পূর্ণ প্রকাশ লাভ হয়েছে। শোভা, যার আয়ুষ্কামনায় নিখিলেশের এই নবজন্ম, তার চিন্তার অগ্রবর্তী সারিগুলি থেকে পিছোতে পিছোতে একেবারে পটভূমিতে ফ্রেস্কো ছবির মত প্রকৃতির বিরাট ক্যানভাসে লেপটে গেল ; আর তার সঙ্গে যা কিছু দৈনন্দিন সংযোগ, যা কিছু দাম্পত্য আচার ব্যবহার, সমস্ত শুধু সেই ছবির বিস্তার হিসাবে পটের উপর পাশাপাশি যোগ হতে লাগল ; মধুর কিন্তু স্থির, রমণীয় কিন্তু একেবারে নিষ্ক্রিয়। শোভা বা শোভাকে নিয়ে যা কিছু, তার মধ্যে নিখিলেশকে নাড়া দেবার বা দুলিয়ে দেবার মত আর কিছুই রইলো না। রইলো না ওদের নবজাত শিশুপুত্রের মধ্যেও।

কিন্তু এও ঠিক যে, এই শান্তির মধ্যেও নিখিলেশের চিত্তের কোন এক সূক্ষ্ম অজানিত কোণে সেই আতঙ্কিত সংশয় কুণ্ডলীপাকানো সাপের মত নিদ্রিত ছিল। কখন এক সময় সেই সর্পিল সংশয়ের

ঘুম ভেঙ্গেছে, তার সরীসৃপ ছোঁয়া পাকে পাকে নিখিলেশের মনকে জড়াতে শুরু করেছে, তার মনে মনে প্রশ্ন উঠেছে। সবই ঠিক সবই ঠিক, কিন্তু কই! সেই একমাত্র অতি-প্রাকৃতিক সাক্ষ্য পুতুলের আকার সেই হরিদ্রাভ মোষের শিং কই?

এক ঝলকে নয়, যেন ক্রমে ক্রমে, নিখিলেশের চৈতন্যের সামনে প্রতিভাত হল এই প্রকৃতি-বিরোধী সাক্ষ্যের অদ্ভুত বীভৎসতা। কি ক্রূর এবং কি হাস্যজনক! তার কপালে শিং উঠবে! উঠবে নিশ্চয়ই। হয়তো ছ'মাসের মধ্যে কিংবা আরও দু'বছর পরে সিং উঠবেই। তখন কি করবে সে? তাকে সংসারে থাকতে হবে, কপালে একটা শিংয়ের মত বস্তু নিয়ে সে পাঁচজনের মধ্যে কেমন করে ঘোরাফেরা করবে? অপারেশন করে ফেলবে? একটা শক্তির খেলায় যে বস্তু এসেছে, তাকে ডাক্তারের ছুরির জোরে বাদ দেওয়া কি নিরাপদ হবে?

যখন উদ্বেগ আসে, এমনভাবে আসে যেন তার কপালে সত্য সত্যই একটা মোষের শিং শোভা পাচ্ছে। আবার এ ভাব কেটে যায়। সংশয় আসে। মনে হয়, এ কখনও সম্ভব? প্রাকৃতিক নিয়মের ঐক্য ঘুচে যাবে, শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যাবে, মানুষের কপালে একটা মোষের শিং গজিয়ে উঠবে, তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক!

তারপর সেই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সম্ভাবনায় নিখিলেশ শুকিয়ে যায়। যদি শিং সত্য সত্যই না ওঠে, যদি এই প্রকৃতি-বিরোধী সাক্ষ্য মোটেই না মেলে! সমস্ত অলীক বলে উড়িয়ে দিতে হবে। তার প্রার্থনার সাড়ায় অনন্ত শক্তির জ্যোতিরূপে আবির্ভাব আর তার স্মৃতি কল্পনার ছল ব'লে মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। সেই অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ-দর্শনের মত জীবনে কোনদিন সে একেবারে অবিশ্বাস্য বলে বর্জনও করতে পারবে না; আবার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলে যে

ইন্দ্রিয়গোচর সাক্ষ্য সে প্রার্থনা করে নিয়েছিল, তা না মেলায় ন্যায়ের স্বাভাবিক নিয়মে ওই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে অতীন্দ্রিয়কে সত্য বলে মেনে জীবনকে পরিচালিত করতে পারবে না।

সমস্ত কথা, সমস্ত আলাপ, সমস্ত অধ্যয়ন, সমস্ত চিন্তার তলায় তলায় সেই অনাবিষ্কৃত শিংয়ের অমোঘ প্রভাব নিখিলেশকে শান্তির কেন্দ্র থেকে বার বার ঠেলে দিতে লাগল। যে ছোটঘরে তার জ্যোতি দর্শন হয়েছিল সেখানে সে মাঝে মাঝে আবার এসে বসত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃসঙ্গ স্তব্ধতায় সেই অভিজ্ঞতার শুরু থেকে তখন অবধি যাবতীয় ঘটনা ঘেঁটে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করত। বিশ্লেষণের শেষে এক একদিন তার মনে হত, যা কিছু সে দেখেছে, সমস্তই তার মনের ভুল। তিনটে সাক্ষ্যের মধ্যে একটা আশ্চর্য মিল আছে। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত-ডাক্তারের সেল-ফ্রেমের চশমা, হিতাংশুর ভ্রূর ওপর ঝুলে পড়া এক গুচ্ছ চুলের ঝুঁটি আর মোষের শিং—সমস্তই কপালগত প্রদেশ নিয়ে। এমন কি হতে পারে, তার সেই সাধু জ্যাঠামহাশয়ের দক্ষিণ ভ্রূর ওপর বীভৎস ক্ষতচিহ্ন, যা শৈশবে তার মনের ওপর অনপনেয় ভীতিগম্ভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার সঙ্গে সাক্ষ্যগুলির এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের যোগাযোগ আছে? যদি তাই হয়, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাকে তো স্মৃতি আর কল্পনার একটা দুষ্ট ষড়যন্ত্র বলে এখনই বর্জন করতে হয়। নিখিলেশ কিছুই স্থির করতে পারে না। সেই জ্যোতির অমিতমধুর সংস্কার তাকে বল্গার মত অবিশ্বাস থেকে টেনে রাখে, কিন্তু সংশয় থেকে বাঁচাতে পারে না।

কখনও কখনও স্নান করে এসে ড্রেসিং টেবলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নিখিলেশ পারিপার্শ্বিক একেবারে ভুলে যেত। চিরুনি হাতে করে আয়নার দিকে চেয়ে সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত আর নিমেষ, ক্ষণ, মিনিট, ঘণ্টা কোথা দিয়ে চলে যেত,

তার হুঁশ থাকত না। শোভা এসে খাওয়ার তাগাদা দিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যেত, কলেজে যাওয়া হত না। কখনও আয়নার অতি নিকটে মুখ নিয়ে গিয়ে, কখনও ঈষৎ তফাতে থেকে, কখনও ডান দিকে কখনও বাঁ দিকে মাথা হেলিয়ে নিখিলেশ ভ্রূর উপর সমস্ত কপালপ্রদেশের প্রত্যেকটি রোমকূপ আলাদা আলাদা করে খুঁটিয়ে দেখত, যদি ত্বকের তলদেশে শিংয়ের আবির্ভাবের কোন সূচনা পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে সে কিছু একটা লক্ষ্য করে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠত। কিছুদিন বহির্জগতের প্রতি তার আচরণ আবার স্বাভাবিক হয়ে আসত। কিন্তু এ ভাব স্থায়ী হত না। যা সে লক্ষ্য করেছিল, মৃগতৃষ্ণিকার মত তার অনস্তিত্ব ধরা পড়ত। তারপর আবার দ্বন্দ্ব, সংশয় আর স্থৈর্যের তিনচাকার গাড়ীতে উঠে একই বৃত্তে অহর্নিশ পরিক্রমা শুরু হত।

চার পাঁচ বছর পরে নিখিলেশ ক্রমে একেবারে অকর্মণ্য হয়ে পড়ল। তার অধ্যাপনা বন্ধ হল, তার লোকজনের সঙ্গে মেশা, সামাজিকতা, শিষ্টাচার একেবারে উঠে গেল, দাম্পত্য-জীবন বরবাদ হল, সাংসারিক কর্তব্য অনাদরে অবহেলায় একপাশে পড়ে রইল। তখন তার আর অন্য কোন কাম্য নেই। সে অর্থ চায় না, মান চায় না, সুখ চায় না, শান্তি চায় না,—প্রপঞ্চের সর্বতোমুখী বাসনা তখন সংহত হয়ে, কেন্দ্রীভূত হয়ে কেবল একটি বিন্দুতে এসে ঠেকেছে; সে বিন্দু ওই মোষের শিং। কায়মনোবাক্যে তখন নিখিলেশ কেবল এইটুকুই চাইছে যে, তার কপালে যতশীঘ্র সম্ভব একটি শিং উঠুক।

আরও তিন-চার বছর পরে কি একটা সামান্য অসুখে শোভার হঠাৎ দেহত্যাগ হল। কিন্তু এই ঘটনার কোন রেখাপাতই হল না নিখিলেশের মনে। কেবল তার ছেলেটি বড় হচ্ছিল আর নিজের

সংসার পরিচালনার কোন সামর্থ্যই ছিল না বলে সে সুরেশের কাছে এসে উঠল।

এই সময়েই একদিন সুরেশের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে নিখিলেশ তাকে জ্যোতিদর্শন থেকে তখন অবধি সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বলে। শুনে সুরেশ সামান্য মানুষের সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে নিখিলেশকে পরামর্শ দেয়, যে শক্তির অনুগ্রহে নিখিলেশ অলৌকিক দর্শন লাভ করেছিল, প্রকৃতি বিরোধী সাক্ষ্যের প্রতিশ্রুতি যখন তাঁর কাছ থেকেই এসেছে, তখন সেই সম্বন্ধে যা কিছু সমস্যা তার সমাধানের জন্য নিখিলেশের আবার তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা উচিত।

এই পরামর্শের সব চেয়ে বড় খুঁত ছিল এই যে, তৃতীয় সাক্ষ্য না মেলায় দর্শনের সত্য প্রকৃতি সম্বন্ধেই সংশয় এসে গিয়েছিল এবং কাজে কাজেই তার মন ন্যায়ের নিয়ম অনুসারে অনন্ত শক্তির সম্ভাবনাতেও আর আস্থা রাখবে কি না, এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারছিল না। তবু নিখিলেশের গভীরতম এবং জাগ্রত মনের অগোচর অহং সংশয়াতীত, স্থির এবং অব্যাকুল ছিল বলে বোধ করি তারই গোপন প্রেরণায় সে কিছুদিন সুরেশকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তখন সে অনুক্ষণ কেবল এই প্রার্থনাই করত যে, প্রতিশ্রুত হরিদ্রাভ শিং তার কপালে আবির্ভূত হোক, প্রকৃতি-বিরোধী সাক্ষ্য মিলে যাক, অনন্ত শক্তির জ্যোতিঃরূপে প্রকাশে সে অন্তর এবং বহিঃসত্তার অণুতে অণুতে নিঃসংশয় হোক।

নিখিলেশের এই অবস্থাতেই আমার হরিদ্বারে সুরেশের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

ঝিক ঝিক করে গাড়ী অল্পক্ষণ পরেই বেনারস ষ্টেশনে এসে থেমে

দাঁড়ালো। ছেলেরা সকলেই নেমে পড়ল। শুধু গিরীন ভদ্রলোকের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ আলাপ করবে বলে পিছনে রইল। গাড়ী কিছু লেটে এসেছিল। ওরা যখন ষ্টেশন থেকে পথে নেমে টাঙ্গা ঠিক করছে, তখন আকাশ পরিষ্কার, সূর্যের তেজ চড়া। মনে হল, এই অঞ্চলে বৃষ্টি বোধ হয় একেবারেই হয়নি।

ভদ্রলোক গিরীনের সাহায্যে সমস্ত বোঁচকা-বুঁচকিগুলি টাঙ্গায় তুললেন, মায় কুঁজোটি পর্যন্ত। একটা কিছু করার পর আর একটা কিছু করায় ভদ্রলোকের গতিটা এমন সাবলীল, চেষ্টাশূন্য এবং সহজ দেখা যাচ্ছিল যেন তিনি কিছুই ভাবছেন না, যেন চলবার সময় একটি পদক্ষেপের পর আর একটি পদক্ষেপ যেমন চলার ঝোঁকে আপনা থেকেই আসে, একটি কাজের পর আর একটি কাজ তেমনি ভিতরের কি একটা ঝোঁকে তাঁর মধ্যে আপনা থেকেই এসে যাচ্ছিল। ভদ্রলোকের কাহিনী এবং গতিবিধি তুই-ই গিরীনের ভাল লেগেছিল। তাঁর টাঙ্গা যখন ছেড়ে দিচ্ছে, ওদিক থেকে ছেলেগুলি চীৎকার করে ডাকাডাকি করছে, তখনও গিরীন পায়ে পায়ে টাঙ্গার পিছু পিছু একটুখানি গেল। তার চোখ সজল হয়ে এসেছিল। বিদায় নেবার ভঙ্গীতে ভদ্রলোকের হাতে একটা হাত রেখে গিরীন বললে, যে গল্পটা আপনি বললেন, তা নিয়ে অনেক আলোচনা করার ইচ্ছা আমার ছিল। সে আর হল না। শুধু একটা কথা আমি আপনাকে না জিজ্ঞাসা করে পারছি না। নিখিলেশের যে অবস্থা, তাতে কি আত্মহত্যা করার ঝোঁক আসতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

ভদ্রলোক অন্যমনার মত একবার এদিক-ওদিক তাকালেন। তারপর গিরীনের দিকে চেয়ে বললেন, একটা কৃতী, বিদ্বান, সকল দিক থেকে সার্থক মানুষ যে অবস্থায় দিবারাত্রি ঈশ্বরের দরবারে, টাকা নয়, পয়সা নয়, যশ নয়, মান নয়, কেবল কপালে একটা হলদে

রঙের ছোট মোষের শিং চায়, সে অবস্থায় কি ঝোঁক আসা সম্ভব বা অসম্ভব তা কি কেউ তালিকা করে বলে দিতে পারে ?

টাঙ্গা জোরে চলতে শুরু করেছিল। ভদ্রলোক দুই হাত কপালে ঈষৎ জোড়া করে সুন্দর হেসে গিরীন এবং দূরের অন্য ছেলেগুলির প্রতি নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন।